যতদূর যাই

প্রবোধকুমার সান্যাল

মিত্রালয়

১০নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

— তিন টাকা —

এই লেখকের অন্যান্য বই—

দেশদেশান্তর	স্বাগতম্
মহাপ্রস্থানের পথে	শ্যামলীর স্বপ্ন
আঁকা বাঁকা	অরণ্যপথ
ভ্রমণ ও কাহিনী	আদি ও অকৃত্রিম
জলকল্লোল	বন্যাসঙ্গিনী
আলো আর আগুন	আগ্নেয়গিরি
অগ্রগামী	কাজললতা
পায়ে হাঁটা পথ	তরঙ্গ

জীবন ও মৃত্যু

নদ ও নদী

বন্দীবিহঙ্গ

অঙ্গার

কল্লান্ত

সরল রেখা

অঙ্গরাগ

রঙীন্ স্থতো

মল্লিকা

আমরা যে অঞ্চলে থাকতুম, সেটার আর এক নাম ছিল বাহির-শিমলা। সবাই জানে, এ অঞ্চলটাই তখন কলকাতার মধ্যকেন্দ্র। আমার বয়স তখন অল্প, আমি পড়ি মিশনারিদের ইস্কুলে। অঙ্কে কাঁচা ছিলুম, ইংরেজিতে তা'র চেয়েও কাঁচা,—কিন্তু বাইবেলশাস্ত্রে আমি ছিলুম পাকা। বাইবেলের গল্পগুলি আমার কণ্ঠস্থ ছিল। খৃষ্টানদের কথা বাদ দিই, কিন্তু বাইবেলের যে এত জনপ্রিয়তা,—সে ওই মনোরম কাহিনী-গুলির জন্যই।

তাছাড়া আর একটি সত্য কথা বলি। আমি আমার ওই ইস্কুল আর গির্জার পাদরীদের অপেক্ষা প্রভু যীশুকে মনে মনে বেশী পছন্দ করতুম। যীশুর জন্মবৃত্তান্ত, তাঁর ভ্রমণকাহিনী, তাঁর আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা, তাঁর অপরূপ স্নেহশীলতা,—আমাকে কতদিন আনমনা ক'রে পথে-পথে ঘুরিয়েছে। পরিশেষে যীশুখৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ ক'রে হত্যা করার কাহিনী অদ্ভুত লাগতো আমার কাছে। অন্তিমকালে প্রভু বলছেন; "হে ঈশ্বর, তুমি ওদের মার্জনা করো—ওরা জানে না কী অপরাধ করছে ওরা।"

একা অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে আমার চোখদুটো জলে ভ'রে উঠতো। অনেকদিন এমন গেছে, আমার এক পয়সা-

দামের ছোট বাইবেলখানা নিয়ে সারাদিন এক কোণে বসে থাকতুম। অন্য পড়াশুনো আর হতো না। বাইবেল পরীক্ষায় ভালো ক'রে পাস করতে পারলে তখন মিশনারিদের কাছে বক্‌শিস জুটতো। সে-বক্‌শিস অনেকবার পেয়েছি। অনেক খৃষ্টানদের বাড়ী থেকে আমি নিমন্ত্রণও পেতুম।

সাহেবী সংস্কার ছিল আমার বাল্যকালে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক, মাথাটি আঁচড়ানো, পায়ে চকচকে জুতো, ফিটফাট চেহারা,—এটাকেই বলছি তখনকার সাহেবী-সংস্কার। অনেক শিক্ষক ছিলেন, যাঁরা বাছাই করা খৃষ্টান,—প্রধান শিক্ষক নিজে খৃষ্টান,—তিনি খাস স্কট্‌ল্যাণ্ডের লোক। তাঁর বয়স ছিল কিছু অল্প। আমি খৃষ্টান শিক্ষকদের কাছে যথেষ্ট প্রিয় ছিলুম না। কেবল বাইবেলের একজন ভাল ছাত্র ছিলুম বলেই তাঁরা আমাকে সহ্য ক'রে নিতেন। বাঙ্গালী খৃষ্টানদের সঙ্গে আমার কেমন যেন একটা বিরোধ লেগে থাকতো।

আমাদের বাড়ীতে ছিল তখন গৃহদেবতা—বাণেশ্বর শিব। ষষ্ঠী, শীতলা, মনসাপুজো ইত্যাদি পর্বে ভট্‌চার্যিমশাই আসতেন ঠাকুরঘরে পুজো করতে। বাড়ীর সকলেই তাঁর প্রিয় ছিল, কিন্তু তিনি আড়ালে-আব্‌ডালে আমাকে দেখলেই দাঁত খিঁচিয়ে চাঁটি মারতেন। আমি কাঁদতুম না, কাউকে ব'লেও দিতুম না—কেবল তাঁর একপাটি খড়ম অথবা পুরনো

ঘোড়তোলা চটিজুতো লুকিয়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে এসে তাঁর পূজার মন্ত্র শুনতুম একাগ্র মনে। ভট্‌চার্যি মন্ত্র পড়তে পড়তেই আড়চক্ষে আমার দিকে তাকাতেন, তিনি আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। আমি সেকালে স্নেহের স্পর্শে যদি বা একটু ভেঙ্গে পড়তুম, কিন্তু আঘাতে আর অপমানে কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতুম।

আমাদের বাড়ীর সামনে অন্ধ গঙ্গার-মা'র ঘরের পাশে যে আস্তাবলটি ছিল সেখানকাব বৃদ্ধ কোচম্যান রহমন আমাদের সকলকেই স্নেহের চক্ষে দেখতো, কিন্তু সেখানে মাঝে-মাঝে এক মোল্লা এসে জুটতো। ঘোড়ার দানা জমা থাকতো যে-কুঠুরীতে অনেক রাত অবধি সেইখানে কোরাণ পাঠ আর কথকতা চলতো। আমি উপরতলার জানলায় ব'সে শুনতুম একমনে। সুরের মাধুর্যটা আমার কানদুটোকে অভিভূত করতো। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমি সেহ মোল্লার প্রিয় হতে পারিনি। সে লোকটি আমাকে দেখলেই মুখ বিকৃত করতো, আর রহমন আমাকে সরে যেতে বলতো সস্নেহ ইঙ্গিতে। দোষ হয়ত আমারই ছিল, কেন না আমি নিজের কথায় ও আচরণে নিজেই মিল খুঁজে পেতুম না। আমার চলাফেরা, ভাবভঙ্গি—সবটাই পরস্পরবিরোধী ছিল। আমি নিজেই নিজের আসল চেহারাটা খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হতুম।

প্রায় প্রতি রবিবার আমাদের 'সান্‌ডে-স্কুল' বসতো। যারা নিয়মিত 'সান্‌ডে-স্কুলে' যেতো, তারা বছরের শেষে পেতো পুরস্কার। সেখানে খৃষ্টধর্মের কথকতা হোতো, তাঁ'র সঙ্গে আলাপ আলোচনা আর উপদেশ। সাহেব হেডমাস্টারের নাক ছিল সোজা.—গ্রীক প্রস্তরমূর্তির মতো। লোকটি যেমন ছিল কড়া আর তেমনি স্বল্পভাষী। যদি কখনও আমার দিকে তাঁর চোখ পড়তো আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠতুম। আমার মনে হোতো, আমার চোখের ভিতর দিয়ে ভদ্রলোক আমার মনের ভিতরকার অন্যায়গুলো লক্ষ্য করছেন। সেদিন সারাদিন আমি অস্বস্তি বোধ করতুম। অনেকদিন পর্যন্ত এই ভদ্রলোকের কাছাকাছি যেতে সাহস হয়নি। কিন্তু একদিন এঁর মুখে হাসি দেখে অনেকটা যেন আস্কারা পেয়েছিলুম। মনে হয়েছিল গাম্ভীর্যের পিছনেই আসল মানুষটার বাসা। আমি গুটি গুটি অগ্রসর হয়েছিলুম তাঁর খাস কামরায়।

মিশনারি ইস্কুলে দুটি বিষয়ে ছেলেদের অতি নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হোতো। একটি বাইবেল, আর একটি ভারতশাসন ব্যাপারে ইংরাজের মহৎ কীর্তি। ভারতে ছিল অরাজকতা, রাজায়-বাদশায় হানাহানি, ঠগীদের উৎপাত, বর্গীর হাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক—এমন সময় ভাগ্যি ইংরাজ এলো। ইংরাজ কত করেছে আমাদের জন্যে! কী দুরবস্থাই আমাদের ছিল, কী অসভ্যই আমরা ছিলুম! পাদরী শিক্ষক আমাদের বাংলায়

বোঝাতেন, ইংরেজ আসবার আগে এদেশের কী ভীষণ অবস্থা! লোকে ধনপ্রাণ নিয়ে কোনকালেই নিরাপদে থাকতে পারতো না। হানাহানি, লুঠতরাজ, যুদ্ধবিপ্লব, হিংসাদ্বেষ ও অরাজকতা, —এই নিয়ে নাকি আমাদের দিন কাটতো।

পাদরীর বক্তৃতা শুনে আমি রাত্রির পর রাত্রি দুর্ভাগা ভারতের কথা ভাবতুম। মনে হোতো, ইংরাজের অপেক্ষা প্রিয়বন্ধু আমাদের আর কেউ নেই। কিন্তু হায়, ইংরেজি ভাষাটা যদি তখন রাতারাতি বাংলার মতো সহজসাধ্য হয়ে উঠতো,—তাহ'লে ইংরেজকে আরো কত ভাল লাগতো। ইংরেজি বই দেখলে আমার গায়ে যেন জ্বর আসতো। তখনও বাংলা ভাষা উপেক্ষিত, অপমানিত,—বাংলা পরীক্ষায় কেউ প্রথম স্থান অধিকার ক'রে বছরের শেষে পুরস্কার নিতে গেলে তা'কে কুণ্ঠিত নতমস্তকে যেতে হোতো। আর ইংরেজি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হওয়া ছাত্র প্রাইজ নিতে এসে দাঁড়ালে চারিদিক থেকে উন্মত্ত করতালি দিয়ে তাকে গৌরবান্বিত করা হোতো। সে-সব ছাত্রকে আমি সেকালে অতিমানব মনে করতুম। তারা আমার ঈর্ষার পাত্র ছিল না, পূজার আধার ছিল।

বড়দিনটিতে কী আনন্দ ছিল আমাদের! রঙীন কাগজের শিকল গেঁথে ঘর দোর সাজাতুম। গির্জার প্রার্থনা সভায় যেতুম ফিটফাট হয়ে। গাছে লজেঞ্জুসের থলি বাঁধা থাকতো,—

যত দূর যাই

আমরা সবাই আসাসোঁটা দিয়ে সেটাকে ফাটিয়ে লজেঞ্জুস কুড়িয়ে আনন্দ করতুম। পাদরী শিক্ষকরা আমাদের বেড়াতে নিয়ে যেতো ইডেন গার্ডেনে,—তখনও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল তৈরী হয়নি। আমরা সুর ক'রে গাইতুম—"প্রভু যীশুনাম, অশেষ গুণধাম, প্রণিপাত করি তব চরণে।" একজন লোক আমাদের কাছে বিনামূল্যে বই বিতরণ করতো, 'মথিলিখিত সুসমাচার।' কেউ বিলোতো ইংরেজি শিশুপাঠ্য ছবির বই। যেমন বিজয়াদশমীর সন্ধ্যায় আমরা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বাড়ী যাই, মিষ্টান্ন পাই, কোলাকুলি করি, শুভেচ্ছা জানাই—ঠিক তেমনি ওই বড়দিনের বিকালে আমরা যেতুম খৃষ্টান বন্ধু ও তা'দের খৃষ্টান গুরুজনদের কাছে। গির্জায় গির্জায়, পাদরীদের পাড়ায়, খৃষ্টান মেয়েদের হষ্টেলে কিংবা বেথুন কলেজে, অথবা সেণ্ট্‌পল্‌স্‌ স্কুলের মাঠে। আমার বাড়ীর লোকেরা ভাবতো, যাক্‌, ছেলেটা এইবার ভদ্রসমাজে আনাগোনা করতে শিখেছে, এইবার হয়তো মানুষ হবে।

তখন অনেকেই মনে করতো, আমি খৃষ্টান। আমার মুখে বাইবেলের গল্প, আনাগোনা গির্জায়, পড়ার সঙ্গী খৃষ্টান বালক, খেলার সাথী পাদরীর ছেলেমেয়েরা,—সুতরাং আমাকে ভিন্নধর্মী ব'লে অনেকে মনে করতো না। একদিন আমি আর একটু এগিয়ে গেলুম। গির্জার পাদরীর কাছে গিয়ে আমি আর আমার বন্ধু নবকুমার প্রকাশ করলুম, আমরা খৃষ্টান

হ'তে চাই। তৎক্ষণাৎ তাঁরা প্রস্তুত। গির্জায় আমাদের ডাকা হোলো, আমরা মন্ত্র পড়লুম, নাম লেখালুম,—অতঃপর জর্ডন নদীর জল আমাদের গায়ে ছিটানো হোলো। আনুষ্ঠানিক ব্যাপার আরো কিছু কিছু হয়েছিল, কিন্তু সব কথা আর এখন আমার মনে নেই। মোটকথা, সেদিন বাড়ী ফিরবার পথে নিজের দিকে চেয়ে দেখলুম, আমি খৃষ্টধর্মাবলম্বী, আমি নাকি আর হিন্দু নই। নিজেরই মনের দিকে আমি বাঁকা কটাক্ষ করতে লাগলুম।

বেশ মনে পড়ছে সেই বছরেই আমার উপনয়ন হয়। মাথা কামিয়ে, কান ছুটো ফুঁড়ে, হাতে দণ্ডী নিয়ে, গলায় পৈতার গোছা ঝুলিয়ে, বেদমন্ত্র পাঠ ক'রে, হোমকুণ্ড সামনে জ্বালিয়ে পট্টবস্ত্র গায়ে চড়িয়ে,—সে এক মস্ত ঘটার উপনয়ন। কিন্তু আমি যে খৃষ্টান, তার উপায় কি? মনে করেছিলুম, কোনোমতে খৃষ্টান হ'তে পারলে আমার একটা মস্ত পরিবর্তন ঘটবে। হয়ত কিছু একটা রাজ্যপাট মিলবে! হয়ত বড় বড় সাহেব-সুবোরা আমার করমর্দন করবে, হয়ত পাদরী শিক্ষকদের সুনজরে পড়বো, হয়ত সাহেব হেডমাস্টার আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবে, হয়ত বা ইংরেজি পরীক্ষায় অন্তত পাস-নম্বরটাও কোনোমতে পেয়ে যাবো! আমার গলায় পৈতার গোছা, কিন্তু নাম লেখা রইলো খৃষ্টানের খাতায়।

বহুকাল পরে সাবালক হয়ে বিবেচনা করেছিলুম, খৃষ্টকে সর্ব-

যত দূর যাই

প্রথম যারা স্বীকার করেছিল তারা সাহেব নয়, শ্বেতচর্মী নয়,—তারা হোলো প্রাচ্যদেশের কয়েকজন পণ্ডিত,—বৃহত্তর ভারতের জনকয়েক জ্যোতিঃশাস্ত্রী। খৃষ্টকে তাঁরাই প্রথম অতিমানব ব'লে মনে করেন। তাঁরা Wise men of the East. সেদিন বুঝতে পারতুম না, মানুষের মূল্যের প্রভেদটা কোথায়! মোল্লার পাশে পাদরী, আর পাদরীর পাশে আমাদের ভটচার্যি—মানুষ হিসাবে এরা পরস্পরের মাঝখানে কোথায় প্রাচীর তুলে রেখেছে, আমার নাবালকের দৃষ্টি অতদূরে পৌঁছত না। জানতুম না ধর্মের ব্যাখ্যা কি, ধর্মান্তর গ্রহণের অর্থ কি, ধর্মে-ধর্মে ঈর্ষার ক্ষেত্রটা কোথায়!

হকি খেলার মাঠে সাহেব হেডমাস্টারের মুখোমুখি আমি দাঁড়ালুম। হকিতে একটু নাম করেছি, এবং আমি দলের ক্যাপ্টেন্। সেদিনকার খেলা হোলো—ছাত্রদল বনাম শিক্ষকদল। সাহেব হেডমাস্টার বাম-প্রতিরোধ-সীমায় খেলছেন। খেলাটা জমেছে। হারজিতের কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এখনও জানা যাচ্ছে না। চারিদিকে লোক দাঁড়িয়ে গেছে। সাহেব মাত্র একজন—আর সকলেই এদেশী। আমি চলেছি বল্ নিয়ে,—সাহেব এলেন প্রতিরোধে। ঠোকাঠুকিতে বল্ গেল ছিট্‌কে বাইরে। সুতরাং একবার 'বুলি' করা দরকার। আমি

আর সাহেব। হকিতে হকিতে সেলাম ঠোকাঠুকি। আমি 'চোরা-ফাউল্' জানতুম,—সুতরাং হেডমাস্টারকে কৌশলে হটিয়ে বল্ নিয়ে চ'লে গেলুম। ঠিক সেই সময় হৈ চৈ উঠলো। সাহেব তাঁর দক্ষিণ পায়ে প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে খুঁড়িয়ে ব'সে পড়েছেন। অপরাধ আমারই, আমি জানতুম। কিন্তু এও জানতুম, ছাত্রদলের সম্মান সেদিন আমাকে রাখতেই হবে। আর তাছাড়া কৌশল প্রকাশ আমি করবই—যদি কেউ আহত হয় তবে আমি দুঃখিত। সেদিন রেফারী ছিলেন এক খৃষ্টান শিক্ষক—তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, আমাকে তিনি সর্বদা চোখে-চোখে রাখছিলেন কিন্তু আমার সুকৌশল 'ফাউল' তিনি লক্ষ্য করেননি।

পরদিন আমি সমবেদনা জানাবার জন্য সাহেব হেড-মাস্টারের ঘরে ঢুকেছিলুম—তাঁর পায়ে তখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। আমি লজ্জিত হয়ে রইলুম।

এর পরেই একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ফুট্‌বল লীগ খেলা দেখতে মাঠে যাই নিয়মিত,—আমি আর রবি। আমরা দুই বন্ধু, তখন অভিন্ন। একদিন ভিড়ের ধাক্কায় আমরা কেমন ক'রে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। ঘোড়-সওয়ার পুলিশ ঘোড়া লেলিয়ে দেয় ভিড়ের মধ্যে, জনতাকে অনেক সময় চাবুক মারে, কুশ্রী গালিগালাজ করে। কিন্তু মোহনবাগানের খেলা সেকালে

যারা নিয়মিত দেখতে যেতো, তারা অনেক সময়ে আত্মসম্মান খোয়াবার ভয় রাখতো না। আমি কেমন ক'রে যেন ভিড়ের ভিতর দিয়ে গ'লে গিয়ে তেরপলের ফাঁক দিয়ে খেলাটা দেখবার চেষ্টা করছিলুম।

তন্ময় হয়ে ভিতর দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় কখন একজন সাহেব সার্জেণ্ট এসেছে লক্ষ্য করিনি। লোকটি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে সহসা আমাকে আক্রমণ করে,—যেন মূর্তিমান হিংসা! আমার উপরে তা'র সেই অতর্কিত নির্দয় আক্রমণ এবং অহেতুক প্রহার দেখে অনেকেই চেঁচামেচি ক'রে উঠেছিল,—কিন্তু সে যে সাহেব! তাকে প্রতিরোধ করার শক্তি কারো ছিল না। রবিকে খুঁজে পেয়েছিলুম অনেক পরে। সাহেবটি যখন ক্রূর কুটিল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে নোংরা উক্তি করছে, আমার মনে প'ড়ে যাচ্ছিল সেই বাইবেলের কথা। এক গালে মারলে আর এক গাল পেতে দিয়ো। "Oh Lord, forgive them, for they know not what they do!" ওরা রাজশক্তি, ওরা দেশ শাসন করে, ওরা সাহেব—ওরা ত' ইচ্ছে করলে মারবেই,—এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা বড় হয়েছিলুম। ওরা সাহেব, ওদের রং শাদা, ওদের মুখ রাঙা,—ওরা ত' মারবেই। ফরাসী, ইংরেজ, আমেরিকান্, ওলন্দাজ,—যে কেউ হোক, ওরা সাহেব, ওদের রং শাদা,—সুতরাং ওরা সবাই ভয়ের প্রতীক্। যদি গৃহস্থপল্লীতে সে যুগে

কখনও একজন সাহেবের আবির্ভাব ঘটতো, তবে তখনই দরজা জানালা বন্ধ হয়ে যেতো,—যেন ডাকাত পড়ার আতঙ্ক। —ওরা, মানে ওই সাহেব পুলিশরা—কোথাও শ্রদ্ধা পায়নি,—ওদের দেখে সবাই সভয় কৌতূহলে উঁকি-ঝুঁকি মেরেছে। ওরা শ্রদ্ধা আদায় করতে চাইতো হিংসার দ্বারা, ভয়প্রদর্শনের দ্বারা, লোভপ্রকাশের দ্বারা, অবজ্ঞার দ্বারা। এখন বুঝতে পারি খৃষ্টানদের উৎসবে কেন আর ঘরদোর সাজাইনে, কেন দীপমালা জ্বালাইনে, কেন বড়দিনের সময় সার্কাস দেখে বেড়াইনে, কেন গির্জার বন্ধুদের সমাজে আর আনা-গোনা করিনে।

অক্স্ফোর্ড মিশন হোষ্টেলের ব্রাউন সাহেবকে মনে পড়ছে। লম্বাচওড়া সেই হাস্যমুখর বৃদ্ধ, সেই সদানন্দ ভদ্র সাহেবটি,—বাহির-শিমলার বালকমাত্রই তাকে জানতো। কত ছবি উপহার দিয়েছে, কত খেলনা আর কত চকোলেট্। ব্রাউন সাহেব রাস্তায় বেরুলে তার চারিদিকে শত শত বালক ও শিশু ভিড় করতো,—কী মিষ্টি, কী স্নেহশীল কী পিতৃপ্রতিম! সেই ব্রাউন সাহেব কত নোংরা অপরিচ্ছন্ন বালককে বিনাদ্বিধায় কোলে তুলে নিত, বালকেরা তার গলা জড়িয়ে কত আবদারই জানাতো। সেই ব্রাউন সাহেব আজকে আর বেঁচে নেই। সে বেঁচে রয়েছে আমাদের মনে-মনে।

মনে পড়ছে কোনো এক দোল-পূর্ণিমার পরের দিনের

কথা। অনেক ছেলে পকেটে আবীর নিয়ে ইস্কুলে গেছে। মিশনারী ইস্কুলে আবীরের আবির্ভাব! সর্বনাশের কথা বৈকি। কোনো কোনো ছেলে দেওয়ালে ছুড়েছে কুঙ্কুম। খৃষ্টান শিক্ষক খবর পাঠালেন খৃষ্টান হেড্‌মাষ্টারের কাছে। তিনি বেত নিয়ে ছুটে এলেন। আমাকে পাওয়া গেল সামনেই। তিনি বেত নিয়ে নির্মমভাবে আমাকে আক্রমণ করলেন। একথা জানাবার সময় পাওয়া গেল না যে, আমার পকেটে আবীরের চিহ্ন নেই, এবং আমার পরিচ্ছদে রংয়ের কোন দাগও নেই। তাঁর কর্তব্য হোলো নির্দয়ের মত প্রহার করা। আমি একে একে গুণলুম, শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে তিনি একুশ ঘা বেত আমার গায়ে বসালেন। আমার হাতে আর পিঠে রক্ত দেখা দিল। আমি শান্তভাবে প্রহার সহ্য করেছিলুম ব'লেই তিনি আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। আজ সেই ভদ্রলোক বেঁচে নেই, কিন্তু সেই বেতের দাগ আজো মুছলো না। সেইদিন সেই বেতের সপাং সপাং শব্দে বাইবেলের গল্প আমার মনে পড়েছিল। যীশুখৃষ্ট চলেছেন পথ দিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে! একটি স্ত্রীলোককে সবাই ঢিল ছুড়ে মেরে হত্যা করবার চেষ্টা করছে। মেয়েটি নাকি অসতী,—পাপিষ্ঠা। খৃষ্ট বললেন, বেশ ত, অপরাধীকে প্রহার করবার অধিকার তারই আছে, জীবনে যে-ব্যক্তি কখনও অপরাধ করেনি। খৃষ্টের কথা শুনে সকলেই লজ্জিত হয়ে চুপ ক'রে গেল।

খৃষ্টান হেডমাস্টারের দিকে আমি চুপ ক'রে চেয়ে ছিলুম সেদিন।

কিছুকাল পরে এলো অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। বাহির-শিমলার ছেলেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সকলের ডাক পড়লো বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলামখানা ত্যাগ ক'রে এসো। লেখাপড়া কেউ ক'রো না—জাতীয় বিদ্যালয়ে এসে সবাই ভর্তি হও। আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই স্বরাজ। জাতীয়তবাদের পালে তখন ঝড়ের হাওয়া এসে লেগেছে। বাহির-শিমলার ছেলেরা স্থির করলো, মিশনারী কলেজের গেটে শুয়ে প'ড়ে ধর্ণা দিতে হবে—কলেজে কারুকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সেই সময়টায় নেমেছিল বর্ষা,—ঝুপ ঝুপ ক'রে সারাদিন ধ'রে বৃষ্টি পড়ছে। আমরা গিয়ে কলেজের গেটের ধারে দিব্যি জল ও কাদার উপরে শুয়ে পড়লুম। আমরা অহিংসা—যদি পুলিশে মারে, তবে প্রতিবাদ করবো না, হিংসার বদলে নির্বিকার ঔদাসীন্য দেখাবো। যদি প্রয়োজন ঘটে, নিত্যানন্দের অভিনয়ও করবো। এইভাবে দিন দুই চলবার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ আর বরদাস্ত করলো না। মিশনারী সাহেব ছিলেন অধ্যক্ষ—তিনি বৃদ্ধ—নিজে এগিয়ে এলেন এবং আমাদের শরীরের উপর দিয়ে তাঁর বুট-জুতো দিয়ে মাড়িয়ে কলেজের ভিতর প্রবেশ করলেন!—তাঁকে

অনুসরণ ক'রে আরো কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্র কলেজে গিয়ে ঢুকলো। আমাব পিঠের উপরে মিশনারী সাহেবের গোড়ালিটির চাপ পড়েছিল। সেটা সাম্রাজ্যবাদের চাপ। সেদিন ভগবদ্‌গীতা আমার পড়া ছিল না, শুধু সেদিনও মুখস্থ ছিল বাইবেলখানা, আর মথি-লিখিত সুসমাচার। যতদিন আমার পিঠে ব্যাথা ছিল, আমি মনে মনে আওড়াতুম—Oh Lord, forgive him.

ভদ্র সাহেব কি এদেশে নেই? আছে বৈ কি,—কিন্তু তারা পথে ঘাটে ঘোরাফেরা করে না। আমাদের কয়েকজনের অভিজ্ঞতায় সাহেবকে দেখেছি রাগী, গম্ভীর, নির্দয়—তবুও তাদের অতিমানব মনে ক'রে এসেছি। তারা ঈশ্বরের একমাত্র প্রতিনিধি, খৃষ্টের উপাসক—এটা সর্বত্র প্রমাণিত। তা'রা দুইটি মহাদেশ,—এশিয়া ও আফ্রিকাকে শাসন করে, পৃথিবীর জল ও স্থলের সর্বত্রই তাদের করতলগত—তা'রা নমস্য। কিন্তু সাহেবরা যে চুরি করে, খুন করে, জালিয়াতি করে, তাদের অনেকের চরিত্রে নৈতিক অপরাধও আছে;—এ সংবাদ জেনেছিলুম অনেককাল পরে। আমার বিশ্বাস ছিল, খৃষ্টীয়-শাস্ত্রে যে-দশটি নিষেধাজ্ঞা আছে; সাহেবমাত্রেই সেই নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে। যে-দিন জানতে পারলুম, খৃষ্টান জগতে সেই নিষেধাজ্ঞাগুলি পদে পদে উপেক্ষিত,—সেদিন কী বেদনা

আমার! যেদিন শুনলুম, বিবাহের আগে সাহেবরা মেয়েদের প্রতি আসক্ত হয়, কিংবা বিবাহিত অনেক সাহেব পরস্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হয়,—সেদিন আমার বিনিদ্র রাত্রির দুশ্চিন্তার কেউ সাক্ষী ছিল না, এই দুঃখ। আমরা মনে করতুম, অন্তত ও বস্তুটা সাহেবদের মধ্যে নেই!

কোনো সাহেব ধর্মপ্রাণ, স্নেহশীল, নিরভিমান, পণ্ডিত, উদারচেতা,—এই সংবাদটি শুনলেই তাকে আমার দেখতে ইচ্ছা করতো। সদাগরী অফিসের বড়সাহেব অথবা ছোট-সাহেবের সঙ্গে চাকরীর জন্য ধোপদস্ত জামাকাপড়ে দেখা করতে গেছি, সেখানে একমাত্র জবাব পাওয়া গেছে,—কি চাও? বেরিয়ে যাও! রাস্তায় চলতে চলতে কোনো সাহেবের গায়ে গা ঠেকে গেছে,—অমনি অপমানের ভাষা শুনেছি। পথে ঘাটে শ্বেতচর্মী সার্জেন্টকে দেখেছি,—ভীম করাল তা'র দৃষ্টি। কোমরের কাছে পিস্তল বাঁধা, হাতে বেটন্। সাহেব রাজকর্মচারী কোথাও চলেছে,—তার কাছে ঘেঁষবার জো নেই। চৌরঙ্গীতে সাহেবদের আনাগোনার পথে যদি কেউ দৈবাৎ পথ অবরোধ ক'রে ফেলেছে,—অমনি কী লাঞ্ছনা তা'র! ট্রেণে সেকেণ্ড ক্লাস অথবা ফার্ষ্ট ক্লাস কামরায় সাহেবের হাতে উৎপীড়ন সয়েছে,—এ ঘটনা তখন প্রায়ই শোনা যেতো। চা-বাগানের সাহেবের অনাচারে কোন্ মেয়ের সর্বনাশ

হয়েছে, কিংবা সাহেবের বুটের ঠোক্করে কোন্ কুলীর পেটের পিলে ফাটলো,—এ সব খবর ছিল নিত্য নিয়মিত। অবশ্য এগুলো বৃহৎ সাহেব সমাজের ব্যতিক্রম মাত্র। আমি ভাবতুম, সেই যীশুখৃষ্ট। তিনি ইউরোপে জন্মাননি, বিলেতেও নয়, আমেরিকাতেও নয়,—তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এশিয়ায়। যে-এশিয়া সাহেবের হাতে শৃঙ্খলিত, সাহেবের পায়ে পদদলিত, যে এশিয়ার রক্তে সাহেবদের লালমুখ রক্তাভ। আমি ভাবতুম, যীশুকে যারা হত্যা করেছিল তারা ইহুদী, কিন্তু খৃষ্টধর্মনীতিকে যারা যুগে যুগে অপমানিত করেছে, তা'রা সাহেব। ইহুদীরা খৃষ্টান জগতে সম্মান পায়নি, আশ্রয় লাভ করেনি,—আর সাহেবরা খৃষ্টজন্মভূমি এশিয়ায় কোথাও অদ্যাবধি প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেনি। ইসলাম-জগতে তারা অশ্রদ্ধেয়, হিন্দু-জগতে তারা অবাঞ্ছিত, বৌদ্ধ-জগতে তা'রা অসম্মানিত। কিন্তু আমি আর রবি সাহেবসুবোকে ভালোবাসতুম অন্তরের সঙ্গে। সাহেব বলতে আমরা অজ্ঞান হতুম। সাহেবী চালচলন, সাহেবী খাদ্য, সাহেবী ভাষা উচ্চারণ, সাহেবদের পাড়ায় ঘোরাঘুরি, সাহেবী কায়দাকানুন—এ সব ছিল আমাদের একান্ত প্রিয়। ফলে, কক্স্ নামক একটি ছোক্‌রা সাহেবের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়। সে-ছোকরা একজন সম্ভ্রান্ত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের ছেলে। তা হোক্, সাহেব ত বটে! তাকে নিয়ে বেড়ানো, সিনেমা দেখা, হোটেলে

খাওয়া, খেলার মাঠে যাওয়া,—সে ছিল আমাদের আভিজাত্যের বিজ্ঞাপন। কক্স্ পরিবারের ভদ্র আচরণ আজো স্মরণ ক'রে আনন্দ পাই।

অনেক সাহেবকে শ্রদ্ধা জানাতে গেছি, কিন্তু কাছে ঘেঁষতে পারিনি। বলতে গেছি, তোমার প্রতি আমরা অনুরক্ত, তোমাদের সভ্যতা, বিদ্যা, জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল,—কিন্তু এসব কথা জানাবার সুযোগ পাইনি। বলতে চেষ্টা করেছি, আমাদের দেশের হৃদয় একদিন অতি সহজে তোমাদের বরণ ক'রে নিয়েছিল, কিন্তু তোমাদের ঔদ্ধত্য, আত্মাভিমান ও আত্মপরতা আমাদের সেই অনুরাগকে অপমানিত করেছে,—কিন্তু এসব কথা শুনবে কে?

রবির মন দিনে দিনে ভাঙতে লাগ্লো। সে আর সাহেবী ঢঙে কথা বলতে চায় না; তার মনে অভিমান জমে উঠেছে।

লাটসাহেবের মোটর যাবে এই বড় রাস্তা দিয়ে। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য—আমি দাঁড়িয়ে আছি সেই ভিড়ের মধ্যে একান্তে। আমি দেখতে চাই লাটসাহেবের চেহারা কেমন। যীশুখৃষ্টের চোখ দুটি ছিল আয়ত সুন্দর, তাম্রচূর্ণের মতো কাঁচা তাঁর দাড়ি, বিস্তৃত বক্ষপট, মুখমণ্ডলের চতুর্দিকে কেমন একটি জ্যোতির্মণ্ডল! আমি

খৃষ্টের চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে লাটসাহেবকে দেখতে চাই। আমার ইচ্ছা, প্রত্যেক প্রকৃত খৃষ্টানের চেহারা খৃষ্টের মতো হবে,—অন্তত আমার কল্পনায়।

লাটসাহেবের মোটর যাবে এই পথ দিয়ে,—অধীর উদ্বিগ্ন দুই চক্ষু আমার। কিন্তু কী দেখতে পাচ্ছি? পথের দুই ধারে সারবন্দী লালপাগড়ী পাহারাওয়ালা,—আর তাদের মাঝে মাঝে সশস্ত্র শ্বেতকায় সার্জেন্ট্। ভাবটা এই, সাবধান, এই রাজপথ দিয়ে যাবে রাজপ্রতিনিধি, টুঁ শব্দটি ক'রো না। সমস্ত আয়োজনটাই যেন জনসাধারণকে ভয় দেখাবার জন্য,—সে একটা ভয়প্রদর্শনের সমারোহ। খৃষ্টের নীতিতে ভয়প্রদর্শনের জায়গা নেই,—বাইবেলে পড়েছি। বাইবেলখানা প্রত্যাহত।

এমন সময় ছুটে এলো লাল মোটর সাইকেল্—তার উপরে সশস্ত্র শ্বেতকায় পুলিশ। তা'র পেছনে আবার বিচিত্র সজ্জায় পুলিশের কর্তারা,—তার পিছনে খান দুই মোটর। সে-মোটরের আরোহীদের দেখা গেল না। দেখতে দেখতে পাহারাওয়ালার সারবন্দী ভেঙে গেল, লোকজন পাতলা হয়ে গেল, সার্জেন্ট্রা চ'লে গেল। শুনলুম, লাটসাহেব এই পথ দিয়ে এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছেন।

আমি বললুম, কই, দেখতে পেলুম না ত?

রবি বললে, গাড়ীখানা দেখেছিস?

কি জানি!

রবি বললে, রাজদর্শন তোর কপালে নেই !

বললুম, তবে ভয় দেখালো কেন ?

রবি আমার কানে কানে বললে, ওরা আমাদের ভয় করে ব'লেই ভয় দেখায়,—বুঝলিনে ?

রবির কথাটা হেঁয়ালী মনে ক'রে, আমি চুপ ক'রে রইলুম ।

মন্দিরে সাহেবদের ঢুকতে দেখেছি,—হিন্দুর দেবমন্দিরে। পরণে কোটপ্যাণ্ট, হাতে হয়ত সিগারেট, চোখে শ্রদ্ধা অপেক্ষা কৌতুক-কৌতূহল, পায়ে মোজা-জুতো। আজকাল জুতোটা হয়ত রবারের কিংবা ক্যাম্বিসের,—কিন্তু জুতো। চেয়ে দেখেছি—মূর্তিমান বেমানান, ছন্দপতন—নিঃশব্দ ঔদ্ধত্য। দেখতে দেখতে গা ঘুলিয়ে উঠেছে, অসম্মান বোধ করেছি, বিমর্ষ হয়ে থেকেছি সারাদিন। হয়ত পূজারী সাহেবের গলায় একগাছা মালা ঝুলিয়ে দিয়েছে ! কোটপ্যাণ্ট, সিগারেট, মোজাজুতো,—তা'র সঙ্গে ফুলের মালা ! ফুলের কী অসম্মান ! সাহেবরা মালা পরে না কোথাও,—তারা ফুলের তোড়া হাতে নেয়,—বড় জোর একটি ফুল গুঁজে রাখে কোটের বোতামের ঘরায়। মালা পরে এদেশে, কারণ মালাটা প্রেম ও মিলনের প্রতীক্। সাহেবদের দেশে মালা নেই,—সেখানে মিলন মালাবদলে নয়, মিলন হাতে হাতে। দেবতার উদ্দেশে আমরা মালা নিবেদন করি,—কেননা দেবভাবে

অনুপ্রাণিত হ'তে চাই। খবরের কাগজে দেখা যায়, অমুক ইং-স্যুরেন্স্ কোম্পানীর কোটপ্যাণ্ট-পরা ম্যানেজার, কিংবা অমুক কাপড়ের মিল-এর কোটপ্যাণ্ট-পরা ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের গলায় উমেদাররা দিয়েছে ফুলের মালা! কী কুৎসিত, কী বীভৎস! যে লোকটা মালা পরে তা'র আত্মসম্মান বোধ নেই, যারা তা'ব গলায় মালা ঝোলায়, তাদের না আছে রুচিবোধ, না বা সৌন্দর্যচেতনা। কোনো সাহেবের গলায় ফুলের মালা দেওয়া হয়েছে, এ সংবাদ শুনলেই আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করে।

ভদ্র মিষ্টপ্রকৃতির সাহেবরা এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু জনসাধারণ তাদের দেখা পায় না,—তা'রা এদেশের ভদ্রসমাজের সঙ্গেও মেলামেশা করে না কিন্তু তারা কোথায় থাকে জানিনে। শুনেছি কোনো কোনো কলেজের কোনো কোনো সাহেব অধ্যাপক ভদ্র ও সুজন। অনেক ছাত্রের মুখে অনেক সাহেবের সুখ্যাতি শুনেছি। অনেক ছেলে ইংরেজি ভাষায় সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে পারলে গৌরব বোধ করে, সাহেবের ফরমাস খাটতে পারলে অনেকে সুখী হয়, সাহেবের কটূক্তি অনেকে প্রাপ্য ব'লে মনে করে, সাহেবের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে অনেককে সলজ্জভাবে হাসতে দেখেছি। কোনো বৈঠকে কোনো সাহেবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পেরে বহুলোক নিজেদের ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করে।

আমি ভাবতুম, কেন এই মনোবৃত্তি ? এটি কি দাসভাব ? পরে মনে হয়েছিল, এইটিই ভালোবাসা ! সুশ্রী তরুণীকে যেমন ছেলেরা কল্পনায় ভালোবাসে, ঠিক তেমনি মনে মনে ভালোবাসে সাহেবকে। প্রত্যেক তরুণ সাহেবকে ভালোবাসে ; —কারণ সাহেবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বৃহৎ পৃথিবীর সম্পর্ক। সাহেবমাত্রেই ছেলেদের প্রিয়। যেখানে যাও—বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ,—সর্বত্রই সাহেবরা তরুণ সমাজের প্রিয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা সর্বমনপ্রাণ দিয়ে সাহেবকে ভালোবেসেছিলুম। সাহেব আমাদের অপমান ক'রেও ভালো-বাসা পায়।

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় একদিন ট্রাম ধরবার জন্য পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় এক সাহেব সার্জেন্ট এসে আমার গায়ে বেটনের গোঁজা দিল। অহেতুক, অনাবশ্যক। অর্থাৎ আঘাত ক'রে বলতে চাইলো, যুদ্ধং দেহি। অহিংসাকে আঘাত করে হিংস্র হয়ে ওঠার জন্য' আমি যে নির্বিরোধ, একথা তা'র জানবার দরকার নেই। আমাকে অকারণে বেটনের গোঁজা দেওয়াই হোলো তা'র চাকরি, তা'র স্বভাবধর্ম। আমি স'রে গেলুম না দেখে সে আবার গোঁজা দিল, এবং কুৎসিত গালি দিল,—কিন্তু তথাপি যে আমি ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলুম ট্রাম না আসা অবধি—এই হোলো তা'র আক্রোশ। সে আমাকে আবার গোঁজা দিল।

এই হোলো সাহেব,—একে অন্ধের মতো আমরা ভালো-বাসতুম গত শতকে!

আগ্রা দুর্গে সাহেব প্রহরী,—ছাড়পত্র না পেলে তারা দুর্গে ঢুকতে দেবে না। দিল্লী দুর্গে আরো কড়াকড়ি। কুণ্ঠিত ও আড়ষ্টভাবে ভিতরে ঢুকতে হবে,—কারণ এগুলি আর এখন আমাদের সম্পত্তি নয়,—ওদের। ঢোকবার আগে হীনতাকে মানতে হবে, তাদের অযথা নির্দেশ পালন করতে হবে। ঝাঁসীতে লক্ষ্মীবাঈয়ের দুর্গের তোরণে দাঁড়িয়ে রয়েছে সশস্ত্র সাহেব প্রহরী। তাকে বোঝাতে হবে, আমাদের অসৎ উদ্দেশ্য নেই, আমরা কেবল দর্শনার্থী। আমরা তাদের অনুগ্রহভাজন। আমার সঙ্গে ছিল একটি ক্যামেরা,—যেমন অনেকেরই থাকে। মনে করেছিলুম রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের কীর্তির ছবি তুলে আনবো। ছবিও নিলুম। কিন্তু ফিরবার পথে ধরলো সাহেবরা। তা'রা ক্যামেরাটিকে জখম ক'রে নেগেটিভ নষ্ট ক'রে দিল। প্রশ্ন করবার অধিকার আমার ছিল না। ভাঙা ক্যামেরাটি নিয়ে নতমস্তকে আমাকে ফিরে আসতে হয়েছিল।

আর—এই সেদিন, মাত্র বছর তিনেক আগে—একজন সাহেব সার্জেণ্ট আমার কপাল লক্ষ্য ক'রে ঢেলা ছুড়লো। বাইবেলের কথাগুলো আমার মনে তখনই ভিড় ক'রে এলো।

খৃষ্টান ধর্ম বলে, আঘাত করো না, বরং আঘাত সহ্য করো। ইসলাম ধর্ম বলে, অপরাধীকে সর্বদা মার্জনা করো। বৈষ্ণবধর্ম বলে, কলসের কানা ছুড়ে মারলেও প্রেমদান করতে ভুলো না। শুধু গীতাধর্ম বলে, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌··· ··

কিন্তু কোনো সাহেবকে হিংসাপ্রকাশ করতে দেখলেই, আমার আজও মনে পড়ে একপয়সা দামের সেই ছোট্ট বাইবেলখানার অন্তর্ভুক্ত দশটি আজ্ঞার কথা! কিন্তু খৃষ্টান হ'লেও সাহেবরা খৃষ্টধর্মকে মানবে, এমন কি বাধ্যবাধকতা? সাহেবদের দেশে খৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেননি, করেছিলেন এশিয়ায়। প্রাচ্যের জ্যোতিঃশাস্ত্রীরা বেথ্‌লেহেমে গিয়ে প্রথম যীশুকে অতিমানব ব'লে মনে করেন। অথচ এশিয়াই বলো, আর ভারতই বলো—এবা সাহেবদের লোভের জায়গা, শ্রদ্ধার জায়গা নয়।

তবু আমরা সাহেবদের এখনও শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি এবং অন্ন জোগাই। তাই আজ সব দিক ভেবে এখনও সময় থাকতে সস্নেহ মিনতি জানিয়ে বলছি, তোমরা এবার চ'লে যাও ভাই,—আর নয়! তোমাদের কাল পূর্ণ হয়েছে।

আমরা তখন থাকি দর্জিপাড়ার ভাড়াবাড়ীতে। আমার বয়স তখন এগারো-বারো। তখন ঘুড়ি-ওড়ানো, পাখী-পোষা, লাট্টু-লেত্তি, পায়রা-তাড়ানো, ব্যাট-বল্ আর গুলি-খেলা-বয়সের এই যুগে তখন আমি। তখনও ইস্কুল পালাতে ঠিক শিখিনি, তবে পেটকাম্ড়ানোর অছিলায় ছুটি নিয়ে থাকি। তখনও গঙ্গার ধারে গোপনে আড্ডা দিতে যাইনে, কিংবা হেদোর জবা-গাছের আড়ালে দুপুরবেলায় হাওয়াগাড়ী-সিগারেট ফুঁকিনে অর্থাৎ অনেকটাই ছেলেমানুষ। আমার সেই চেহারাটায় সেকালে অনেকখানি প্রাণহীন সরলতা ছিল,—মানে, অর্বাচীন বললে যে-ছবি ফোটে চোখের সাম্‌নে—অনেকটা তাই। তবে অন্তরঙ্গরা বলতো, আমি নাকি অতি ধূর্ত। আমার ধারণা, আমি নিজের সম্বন্ধে আজও কোনো নির্ভুল পরিচয়-পত্র পাইনি।

ঘুড়ি-ওড়ানো ছিল আমার কাছে সব-চেয়ে প্রিয়। লাল, নীল, সবুজ,—নানাবর্ণের বিচিত্র ঘুড়ি ঘুরে-ঘুরে চলেছে আকাশ থেকে আকাশে, আমার নিয়ন্ত্রণে সে চলেছে দূর থেকে দূরান্তরে,—আমি বড় আনন্দ পেতুম। ওটাকে আমার অবোধ-কল্পনার যথেচ্ছ-বিচরণের প্রতীক ব'লে মনে করতুম,—আমার একাগ্র একান্ত, উৎসুক কল্পনা যেন স্বর্গ, মর্ত, পাতাল একাকার ক'রে

বেড়াতো। তা ছাড়া ধরো, এক-পয়সা দামের ঘুড়ি—ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণমর্জী ঘুড়ি,—সে পৌঁছতে পারতো যেখানে-সেখানে,—আমি কোনোকালেই যাদের নাগাল পেতুম না। নিজের ঘুড়ির সঙ্গে আমার নিজেরই কেমন ঈর্ষার সম্পর্ক ছিল। ঘুড়ির পয়সা যখন জোগাড় করতে পারতুম না—তখন লাটাইয়ের সূতোটুকু নিয়ে কি করব তাই ভাবতুম। একটি বঁড়শি একদিন পাওয়া গেল। শুনেছিলুম, বঁড়শি দিয়ে নাকি মাছ ধরে। কিন্তু পুকুর কাছাকাছি কোথাও নেই, সুতরাং মাছ ধরা সম্ভব নয়। আমি আমার সূতোর মুখে বঁড়শি বেঁধে পাশের বাড়ীর নতুন-বৌয়ের ঘরে ফেলতুম। সুবিধে ছিল, কারণ নীচের তলায় ছিল তাদের ঘর, আর আমি থাকতুম একতলার ছাদে।

নতুন-বৌয়ের ঘরে থাকতো এটা-ওটা, জামা-কাপড, সিল্কের রুমাল, চুল-বাঁধার লাল রেশমী ফিতে। জানলার কাছেই নতুন বৌদের জামা-কাপড় ঝোলানো থাকতো। একদিন দুপুরবেলা জানলার ভেতর দিয়ে বঁড়শি ফেলে আমি একটি জামা টেনে আনলুম। সব শরীর আমার কাঁপছে তখন ভয়ে, হাত-পাগুলো ঠক্‌ঠক্‌ করছে। আমার ঝোঁক ছিল, সিল্কের রুমালের দিকে, কিন্তু—এ কি উঠে এলো! জামাটা বঁড়শি থেকে খুলে পাশের গলিতে ফেলে দিয়ে আমি সেদিনের মতন গা-ঢাকা দিলুম। মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় ওই সিল্কের রুমাল, কিংবা অন্তত

আমার নিজের পছন্দসই কিছু একটা। কিন্তু, আমি কী চাই, ঠিক জানিনে। অথচ আমার মন দিবারাত্র আবদার ধরে থাকে, পছন্দসই জিনিস খোঁজে, এবং যা পায় তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়—কোনোটাই পছন্দ হয় না।

একদিন দেখি, নতুন-বৌয়ের জানলার ধারে একটি রংচঙে টিনের তৈরী জাপানী রেলগাড়ী প'ড়ে রয়েছে। রেলগাড়ীখানা ও-বাড়ীর ঘুঁতুর—আমি জানতুম। আমাকে সে একবারটি টানতে দেয়নি, এও মনে ছিল। তৎক্ষণাৎ বঁড়শির মুখে একটি ছোট্ট ঢিল বেঁধে জানলা দিয়ে গলিয়ে ভিতরে ফেললুম। টিপ ক'রে ঠিক ফেলতে পারিনি, সুতরাং বঁড়শিটি রেলগাড়ীর চাকার পাশে লাগলো না,—মেঝের দিকে ছিট্‌কে গেল। আমি জানতুম না, সেই মেঝের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল নতুন-বৌ,—তা'র খোঁপায় আট্‌কে গিয়েছিল আমার বঁড়শি। আমি যত টানি, কোথায় যেন টান পড়ে। অবশেষে টানাটানি করতে গিয়ে সহসা নতুন-বৌ হাউমাউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো। আমি যে নতুন-বৌকে বঁড়শি দিয়ে গেঁথে টেনে তুলতে চাইনি, একথা কাউকে বোঝাতে না পারবার ভয়ে তৎক্ষণাৎ সুতো ছিঁড়ে ফেলে ছাদ থেকে পিটটান দিয়েছিলুম। তারপর সন্দেহক্রমে আমার পেছনে অবিশ্যি গোয়েন্দা লেগেছিল, কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণের অভাবে এবং আমার আপাতসরলতার গুণে সে-যাত্রা ধরা পড়িনি।

বাড়ীর ফাই-ফরমাস প্রায় আমাকেই খাটতে হোতো। এক দাদা চাকরি করে, সুতরাং তা'র গাম্ভীর্য বেড়েছে,—আর এক দাদা পাস ক'রে চাকরি খুঁজছে,—সুতরাং সে প্রায় সাবালক। ফাই-ফরমাস খাটতে তাদের সম্মানে বাধে।—কোনো দিদি এসেছে শ্বশুরবাড়ী থেকে—তা'র ছেলেমেয়েদের কান্না ভোলাও, খাবার কিনে আনো, বেড়াতে নিয়ে যাও, অমুককে খাবার দিয়ে এসো, দই কিনে আনো, কিংবা আল্তা-সিঁদুর কিনে এনে দাও,—এসব কাজ আমাকেই করতে হোতো। এ-ছাড়া পাঁচবার চিঠি ফেলতে যাওয়া, কিংবা পোষ্ট-অফিস থেকে খাম-পোষ্টকার্ড কিনে আনা,—এসব কাজের জন্যেই ত' ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন। আমার লেখা-পড়ার ব্যাপারটা কারো কাছেই প্রধান্ ছিল না—ওটাকে সকলেই কৃপার চক্ষে দেখতো। অনেক সময় ছেঁড়া কাগজ না পেয়ে আমার বই, খাতার পাতা ছিঁড়ে বাড়ীর লোকেরা নানা কাজে লাগাতো। আমি খুশী হতুম, কেননা, লেখাপড়া না করার অনেক অজুহাত জুটে যেতো। আর তা'ছাড়া আমার পড়া-শুনো আর কতদূরেই বা এগোবে।

বাড়ীতে জামাই এলে,—আমি তৎক্ষণাৎ তা'র চাকর ব'নে যেতুম। তা'র স্নানের তেল, তোয়ালে, সাবান, গাড়ু—এসবের ভার আমার ওপর। তাদের ফাই-ফরমাস, পান-সিগারেট, জুতো-জামা, তাদের জল দেওয়া, পাখার বাতাস করা, পাহারা

দেওয়া,—সব দায়িত্ব আমারই। অবশেষে তাদের উচ্ছিষ্ট ভাগ ক'রে নিয়ে কী আনন্দ আমার! অনেক সময়ে পুরনো জামাইরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমার হাতে গোটা-চারেক পয়সা গুঁজে দিত,—আমি হাতে স্বর্গ পেতুম। অনেক সময় কোনো-কোনো জামাইয়ের চোখে হয়ত ঘুম আসতো না,—আমি দৌড়ে ও-পাড়ায় গিয়ে বটোকেষ্টবাবুর বাড়ী থেকে বটতলার নভেল্ এনে দিতুম। কিছু না পেতুম ত' একখানা 'বীণার-ঝঙ্কার!'

সমস্ত কাজের পরে কিন্তু কোথাও ধন্যবাদ পেতুমনা। অনেক লোক আমাকে জন্তুর মতন খাটিয়ে নিত। কেউ-কেউ হয়ত মুখ তুলে তাকাতো এক-এক সময়ে। হয়ত ভাবতো, এ-বাড়ীতে এ-ছেলেটার কি কোনো দাম নেই? বাড়ীতে অন্য কোনো ছোট ছেলে আবদার ধরলে তা'র সহস্র প্রকার তুষ্টি-সাধন ক'রে তা'কে ভোলানো হোতো—কিন্তু আমার কপাল মন্দ, আবদারের কোনো আভাসমাত্র প্রকাশ করলেই চারিদিক্ থেকে কদর্য কঠিন শাসন আমার প্রতি চোখ রাঙিয়ে উঠতো, অনেক সময়ে পিঠ বেঁকে যেতো মার খেয়ে। আমার দিদিমা হাতের কাছে না থাকলেই আমার যত দুর্গতি। দর্জিপাড়ার বাড়ীতে দিদিমা ছিলেন না।

সন্ধ্যার দিকে আমার মন খারাপ হোতো বেশী। আলো জ্বলছে ভিতরে, এখানে-ওখানে গল্পগুজবের কলরোল, এঘরে-

ওঘরে আনন্দের কলরব,—তখন আমাকে আর কারো প্রয়োজন হোতো না,—সকলের সব কাজ তখন ফুরিয়ে গেছে। আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে তখন কতকগুলো ঢিল্ সংগ্রহ করতুম, তারপর এক-একটি ছুড়তুম প্রাণপণ শক্তিতে,—যে-কোনো দিকে, যে-কোনো খানে, যে-কোনো বাড়ীতে। কা'কে লক্ষ্য ক'রে ছুড়তুম জানিনে কিন্তু তীব্র ঘৃণা আর তীক্ষ্ণ আক্রোশ আমার সেই ঢিলগুলিতে লাগানো থাকতো। আমি সে-যুগে মনে মনে কাউকে ক্ষমা করতে পারতুম না। আমার প্রত্যেকটি ঢিল প্রচণ্ড ধারালো প্রতিবাদের মতো দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে যেতো। আমি বেশ অনুভব করতুম, আমার মনের মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন আদর্শের বিপ্লববাদী দল যুদ্ধ বাধিয়ে হানাহানি করছে। অবশেষে নিজের চোখ আমার জলে ভ'রে আসতো।

বিদেশ থেকে আমার এক দাদা আর বৌদিদি এলেন। তাঁরা দূরের মানুষ, কত দেশ-দেশান্তরের দাগ তাঁদের সর্বাঙ্গে, পৃথিবীর কত সংবাদ তাঁদের আলাপে.—কী ভাল লাগতো আমার—কি বলবো। গ্রাণ্ডকর্ড লাইন, অযোধ্যা ও কুমায়ুন, দিল্লী ও রাজপুতনা,—আমার মনে ইন্দ্রজাল বুনতো। আমি সেই দাদা ও বৌদিদির আশেপাশে সারাদিন মেনি-বেড়ালের মতো ঘুরে বেড়াতুম। হাতে পায়ে কাজ করতুম, কিন্তু কান দুটো খাড়া হয়ে থাকতো ওঁদের দিকে। তাঁরা এলেই আমাদের

বাড়ীতে উৎসব লেগে যেতো। বৌদিদি কিসে তুষ্ট থাকেন, দাদা কিসে আরাম পান—এই ছিল আমার চিন্তা। আমি দাদার চুলেব মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতুম, বৌদিদির জন্য স্নূর্তি কিনে আনতুম, দাদার সিগারেট এনে দিতুম, বৌদিদির স্নানেব পর কলতলায় শাড়ী জোগাতুম, দাদার গেঞ্জি শুকিয়ে দিতুম, বৌদিদির জন্য বেলফুল কিনে আনতুম। অবিশ্রান্ত অহোরাত্র দাদা আর বৌদিদির সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে আমি লেশমাত্র ত্রুটি রাখতুম না।

বিদেশ যাত্রার আগের দিন দাদা স্থির করলেন সকলকে মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়ে যাবেন। সবাই যাবে, বাড়ীসুদ্ধ সবাই সমস্ত দিন কী অধীর আনন্দ! সে এক নতুন জগৎ, নতুন জীবন, —সে নাকি ইন্দ্রের অমরাবতী। স্বর্গ সেইখানে, সেখানে পারিজাত-কানন, সেখানে অপ্সরী কিন্নরীদলের শূন্যলোকে নিত্য আনাগোনা। আমি ভাবছিলুম কতক্ষণে সন্ধ্যা হবে কতক্ষণে পূজোব ঘবে আবতিব শাঁখ বাজবে! দিদিরা যাবে, মাউইমা যাবেন, তাঁব বোন, দাদারা, বৌদি, বৌদিদির চাকর ও ঝি,—ওবা যাবে আট আনার টিকিটে, আর সবাই যাবে দু'টাকার টিকিটে—আজ সবাই না গেলে আনন্দ অপূর্ণ থেকে যাবে!

সন্ধ্যার পর আমরা গিয়ে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া ক'রে আনলুম —কারণ তখন ট্যাক্সির অতটা চল্ হয়নি,—সবাই সেজেগুজে গাড়ীতে উঠছেন, —মাসিমা এলেন, পূর্ণবাবু এলো, অবিনাশ-

বাবুর বৌ এলো—সকলেই যাবে; তারপর দিদিরা আর বৌদিদিরা আর দাদারা,—মস্ত বিরাট এক দল! আমি বিকাল থেকে সেজেগুজে আছি, আমি উঠবো কোথায়? চাকর উঠলো, ঝি উঠলো,—আমি? ও মা, গাড়ী যে ছেড়ে দিল, আমাকে নিল না? তবে কি আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে না?—ঘোড়ার গাড়ীর পিছন থেকে বুকফাটা চীৎকার করতে গিয়ে গলার ভিতর থেকে রক্তোচ্ছ্বাসের মতো কান্না উঠে এলো। গাড়ী থেকে গলা বাড়িয়ে কে যেন জানিয়ে দিয়ে গেল, ছেলেমানুষ যেখানে-সেখানে যেতে নেই!

গাড়ী চ'লে গেল, আমাকে নিয়ে গেল না। আনন্দের কোনো আয়োজনে যোগদান করার অধিকার আমার নেই! আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম।—বেদনাকে ধারণ ক'রে রাখার শক্তি আমার কিছু ছিল বৈ কি।

দোলপূর্ণিমার রাত্রে সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছি। বাড়ীসুদ্ধ নিশুতি। বোধহয় রাত বারোটাই হবে। এমন সময় একটা মস্ত গানের দল পাড়ার পথে মিছিল ক'রে চলেছে। উচ্চ ঐকতানের কোলাহলে সকলের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, সবাই গিয়ে সদর দরজার কাছে দাঁড়ালো। আমার তখন ঘুমচোখ;—সুতরাং সেই গানের ললিত-সুরে দোলপূর্ণিমার রাতটাও আমার চোখে কেমন যেন অবাস্তব স্বপ্নলোক মনে হয়েছিল। আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে চললুম গানওয়ালাদের সঙ্গে।

যত দূর যাই

আমার পেছনে যে শাসন ছিল, বাঁধন ছিল,—একথা সেবাত্রে ভাববার সময় পেলুম না। আমি যেন 'নিশিপাওয়া'-ছেলে, কে যেন প্রবল আকর্ষণে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। কোন্ পথ দিয়ে কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, এ-পথের শেষ কোথা, ফিরবো কেমন ক'রে, রাত এখন কত,—সমস্ত বৈষয়িক চিন্তার লেশমাত্র আমার মনে ছিল না। আমি গানের প্রবাহে ভেসে চলেছি সুরের অচ্ছেদ্য আকর্ষণে। সেই গানের বারংবার পুনরাবৃত্তির জন্য আমিও একসময়ে সেই গানের কলি ধরেছি—

"আর দিয়ো না বেদনা
ধরি পায়, শ্যামরায়,
ফিরে চল বৃন্দাবন।
কেমনে কঠিন প্রাণে ছিলে মথুরায়,
ফিরে চল বৃন্দাবনে, মনে নাহি, মায়ে
মমতার সখ্যতায় দিয়েছ কি বিসর্জন।"

এর সঙ্গে আবার ধুয়ো—"রসিক শেখর শ্যাম-নটবর
কালো অঙ্গ হোলো লাল মনোহর—"

ওই গানের পরমার্থ দেখেছিলুম দোলপূর্ণিমার সেই গভীর রাত্রে, পেয়েছিলুম জীবনের একটি আশ্চর্য সত্যকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাটার কথা আমার সেদিন একেবারেই মনে ছিল না; গানের একটি নিবিড় মোহমাদকতায় যেন আমি জরোজরো,

যেন সমস্তটাই প্রলাপ, সবটাই একটা মাধুর্যের বিকার। আমি সম্পূর্ণ উদভ্রান্ত, দিক্‌ভ্রান্ত, আত্মবিস্মৃত,—আপন সত্তা আমার হারিয়ে গেছে।

অবশেষে গঙ্গার ধারে এসে সেই গান যখন থামলো, আমি চমকে উঠলুম। সেটা বাগবাজারের ঘাটের কাছাকাছি,—অর্থাৎ মদনমোহনতলা পেরিয়ে কুমোরটুলীর ঘাট। সেই রাত্রে ছুটতে ছুটতে বাড়ী এসে পৌঁছলুম, তখন আমার কপালে কি-কি লাঞ্ছনা ঘটলো,—তা'র কি বিশদ বর্ণনার দরকার?

আমাদের বাড়ীর উত্তর দিকটায় ছিল খোলার বস্তি, তার, সামনের দিকের অংশটায় ছিল দীপুদের আড্ডা। দীপু কেরোসিন তেল বিক্রি করে, আর তার পোষা টিয়াপাখীটিকে ছোলা খাওয়ায়। রেড়ির তেলের আলো-জ্বালাটা কলকাতায় তখনও রয়েছে, তবে কেরোসিন তেলটা ব্যবহার করে বড়-লোকেরা--যারা আধুনিক আর দুঃসাহসী। আমার দিদিমা বল-তেন, কেরোসিনের আলোয় ব'সে লেখাপড়া করলে তাড়াতাড়ি চোখ নষ্ট হয়। সুতরাং আমাদের ভাগ্যে ওই রেড়ির তেল! আমরা দীপুর কাছে কেরোসিন কিনতুম না, এই ছিল তা'র মস্ত অভিমান। সে বলতো, কেরোসিন জ্বালিয়ে না রাখলে বাড়ীতে চোর আসে, তা বলে দিচ্ছি।

মামা দীপুকে চিনতেন। বলতেন, তুমি যদি দয়া করো, তবে আর এবাড়ীতে চোর ঢুকবে না।

কথাটা দীপুর তেমন ভাল লাগতো না। সত্যি বলতে কি, এই নিয়ে তা'র একটা স্থায়ী বদনামও ছিল। অনেকে ভাবতো, শুধু কেরোসিন বিক্রি ক'রে দীপুর কেমন ক'রে চলে ? এক বোতল কেরোসিনের দাম পাঁচ পয়সা,—এক বোতল বেচতে পারলে মাত্র আধপয়সা লাভ,—আর দশ বোতলের বেশী দীপু মাথায় ক'রে বেচতে কোনোদিনই পারতো না। অথচ সে দেশে টাকা পাঠায়, এখানে নিজের খরচ চালায়, ঘর ভাড়া দেয়, টিয়াপাখীটিকে ছোলা খাওয়ায়,—এত সে পায় কোথা থেকে! যারা দীপুকে জানে তারা বলে, ওর ঘরে লোহার সিন্দুক আছে তা জানো কি ?

আমরা সবাই দীপুকে ভয় করতুম। একবার যদি আমাদের দিকে সে তাকিয়েছে—ব্যস, আমরা দে ছুট, আর পিছনে চাইতুম না। তা'র সঙ্গে কেমন একটা ভয় জড়ানো ছিল। ষণ্ডাগুণ্ডা তা'র চেহারা, তা'র উপর সে যখন রাস্তার ধারে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে তেল মাখতো,—তা'র গায়ের পেশীগুলো ফুলে উঠতো। ওর একটা ঘুসি খেলেই ত একেবারে অক্কা! দীপুর সাম্‌নে দিয়ে আমরা কোনাদিনই হাঁটতুম না।

মামার কাছে শুনতুম, দীপুর বাড়ী নাকি পশ্চিমে। বছরে একবার সে দেশে যায়, তারপর ফিরে এসে সারা বছর ধ'রে

কেরোসিন বিক্রি করে। দীপু ছিল আমাদের পাড়ার বস্তি-সর্দার।

একদিন দিদিমা দীপুকে ডাকতে পাঠালেন। দীপু এসে দাঁড়িয়ে বললে, কি মা ?

দিদিমা বললেন, কাল রাত্রে নীচের ঘরের জানলার গরাদ কে যেন ভেঙেছে, তুমি কিছু জানো বাবা ?

দীপু আকাশ থেকে পড়লো, বললো, কই, না !

দিদিমা বললেন, দোহাই বাবা···আমার বাড়ীতে যেন চুরি না হয়, তুমি একটু দেখো।

দীপু বললে, বিলক্ষণ, দেখবো বৈকি, বুড়িমা। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে, আপনার বাড়ীতে চুরি হবে ?

দিদিমা নতুন গুড়ের পাটালি বা'র ক'র দীপুকে জল খেতে দিলেন।

কিন্তু এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই আমাদের বাড়ীর নীচের তলা থেকে একরাশ বাসনপত্র চুরি গেল। দিদিমার চীৎকার, মামার হাঁকডাক। দিদিমা ছুটলেন গণৎকারের বাড়ীতে।

গণৎকার গুণে বললে, এ কোনো ছিঁচ্‌কে চোরের কাজ··· আপনার বাড়ীর কাছাকাছি সে থাকে। এ হোলো জানা চোর।

আমরা স্থির করলুম, দীপু ছাড়া আর কেউ নয়। মামা চেঁচিয়ে বললেন, আমি এখনি পুলিশে খবর দেবো। কে

এমন কাজ করেছে তা আমরা সবাই জানি। এই আমি চললুম।

এমন সময় দীপু এসে দাঁড়ালো। বললে, বড়বাবু, আপনি ভাবছেন এ দীপুরই কাজ, কেমন? কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই! পুলিশে মামলা করলে আপনাদেরই ছুটোছুটি করতে হবে। আমার জেল হবে না আমি ঠিক জানি—তবে দুই চারদিন হাজতে থাকতে পারি।

মামা বললেন, চুরি যে করেছে তারই শাস্তি হবে!

দীপু হেসে বললে, যারা আমার নামে মিথ্যে নালিশ করবে, তাদেরও শাস্তি হতে পারে বড়বাবু।

মামা চুপ, আর তাঁর মুখে কথা নেই। দীপু বললে, তা'র চেয়ে আসুন মিটমাট ক'রে ফেলি। ক'খানা বাসন গেছে আপনার?

মামা বললেন, ছ'খানা থালা, চোদ্দটা বাটি, চারটে গেলাস, দুটো হাঁড়ি···

দীপু বললে, আচ্ছা বেশ···আপনি চুপ ক'রে থাকুন, আমি আপনার চোরাই মাল বা'র ক'রে দিচ্ছি—

এই ঘটনার চার পাঁচ দিন পরে আমাদের বাড়ীর তেতলার ছাদে আমাদের চুরি-যাওয়া বাসন-পত্রের অনেকগুলি পাওয়া গেল। সবাই অবাক্। দীপুর লোক কেমন করে ছাদে উঠে বাসন রেখে এলো, এই নিয়ে সকলেই আলোচনা করতে

লাগলো। আমরা এই কথাটা জানতে পেরেছি, চোর ধরবার সাহস আমাদের কারো নেই!

মাঝরাত্রে এক একদিন আমারো ঘুম ভেঙে যেতো। বিটের পাহারাওয়ালা হেঁকে চলেছে—'বাড়ীওয়ালা সামালো, জাগে রহো।' নিশুতি রাত্রে পাহারাওয়ালার পায়ের নালবাঁধানো জুতো আর লাঠির ঠক্‌ঠক্ শব্দ শোনা যেতো। কিন্তু সেই সেপাইটি আমাদের বাড়ীর উত্তর দিকের বস্তির কাছাকাছি এলেই আর তার সাড়াশব্দ পেতুম না।

মামা একদিন বললেন, আমি বলেছিলুম, পাহারাওয়ালার সঙ্গে দীপুর ষড় আছে।...ওই দেখে এসো চুপি চুপি, ওরা দুজনে গলায় গলায়...ব'সে ব'সে দু'জনে খৈনি টিপছে!

দিদিমা বললেন, যে-রক্ষক সেই ভক্ষক।

একবার হঠাৎ রাত্রে শোনা গেল, চোর এসে নীচের তলাকার ঘরের দরজা কাটছে। আস্তে আস্তে কুর্‌কুর্ ক'রে দরজা কাটছে,—পাছে বেশী শব্দ হলে আমরা জেগে উঠি। কিন্তু সেদিন আমাদের মাথায় খুন চাপলো। আমরা পাঁচ ভাই মিলে লাঠি হাতে নিলুম, মামা নিলেন একখানা কাটারী, আর দিদিমা হাতে নিলেন বঁটি। আমরা সবাই নিঃসাড়ে দরজার এদিকে গিয়ে দাঁড়ালুম, আর ওদিকে চোরে তখন দরজা কাটছে। আমরা স্থির করলুম, আগে দীপুর মাথায় লাঠি মারবো, তারপর দরকার হলে বঁটি আর কাটারী।

কিন্তু একটা কথা, দরজা আমরা কিছুতেই খুলবো না—কি জানি, যদি জনদশেক লোক দীপুব সঙ্গে ভিতরে ঢুকে আসে? সুতরাং আমরা স্থির হয়ে রইলুম, ওরা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলে তবে আমরা আক্রমণ চালাবো। তার আগে নয়।
প্রায় সারারাত আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করে রইলুম, কিন্তু দরজা কাটা দীপুর আর শেষ হোলো না। ভোরবেলায় তারা পালিয়ে গেল, আর আমরা দবজা খুলে দেখি, কেউ কোথাও নেই।

মিথ্যে কথা না বলাই ভালো। আমরা দলবেঁধে লাঠি সোঁটা নিয়ে অপেক্ষা ক'রে থাকলেও,—দীপুকে মারতে হবে, এই কল্পনায় ভয়ে আমাদের হাত পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতো। তবু উপায় নেই, দরজা কাটার শব্দ আরম্ভ হলেই আমরা সবাই লাঠি-বঁটি নিয়ে দাঁড়াই। এমনি ক'রে অনেক দিন পর্য্যন্ত দরজা কাটাও চললো, আর আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাও চললো। অবশেষে অনেকদিন পরে হঠাৎ একদিন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেলো। সেই কথাটা বলি।
সেদিন রাত্রে বোধ হয় ছোট একখানা করাত দিয়ে দীপু যখন দরজা কাটছে, মামা বললেন, আমি কানাচ দিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখি ত ওরা ক'জন?
মামার একটু যেন সাহস বেড়েছে এতদিন পরে। কিন্তু তিনি গিয়ে যখন কানাচে উঁকি মারছেন, তখন আশেপাশে

কোথাও দীপুর চিহ্নও নেই, চোরের গন্ধও নেই। তবে ব্যাপার কি? অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মামার যেন একটু সন্দেহ হোলো। তিনি ফিরে এসে দিদিমার কানে কানে শুধু বললেন, মানুষ নয়!

ভয় আর বিভীষিকায় আমাদের সকলের শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। লাঠি-সোটাসুদ্ধ হাতখানা অবশ হয়ে এলো। দিদিমা প্রশ্ন করলেন, মানুষ নয়? মানুষ নয়! তবে?

মামা অন্ধকারে তাঁর একমুখ কালো মাড়ি কাছে এনে ঝক্‌ঝকে দাঁতের পাটি বার ক'রে বললেন, পিশাচ—মড়ার খুলি দিয়ে দরজা কাটছে!

দিদিমা বললেন, তুই দেখতে পেলি?

মামা বললেন, পষ্ট দেখলুম···রাম নাম···রাম নাম···

আমরা সবাই চুপ। ভূতপ্রেতে আমাদের ভয়ানক বিশ্বাস, সন্ধ্যার পর রেড়ির তেলের প্রদীপ নিয়ে নীচের তলায় কেউ নামলেই অন্ধকার গহ্বর থেকে ভূতের নিঃশ্বাসে প্রদীপের আলো নিবে যায়। অমনি হাউমাউ ক'রে সে চেঁচিয়ে ওঠে! সেইজন্য লক্ষ টাকা কেউ দিলেও একা কেউ নীচের তলায় যেতে ভরসা পায় না। পিশাচ এসে রোজ রাত্রে দরজা কাটে, একথা শোনবার পর থেকে আর কেউ লাঠি কিংবা বঁটি নিয়ে নীচের তলায় নামতে সাহস পায় না। সুতরাং তখন আমরা স্থির করলুম, দীপু একজন সাধু লোক। তাকে সন্দেহ করার

জন্য সকলেই লজ্জিত। তা ছাড়া আসল কথাটা এই যে, আমরা ত আর কেউ কখনো দীপুকে চুরি করতে দেখিনি।

দিদিমা দীপুকে ডাকলেন,—দীপু এলো। দিদিমা বললেন, বাবা, ভূতের জ্বালায় ত আর টেক্‌তে পারিনে!

দীপু মুখ টিপে হেসে বললে, কোথায় বুড়িমা?

দিদিমা বললেন, তোমাদের ওই কানাচে। রোজ রাতে এসে পিশাচ আমাদের দরজা কাটে।

দীপু ভীষণ চিন্তিত হয়ে বললে, তাই ত! ওই কানাচে মাঝে মাঝে পিশাচ আসে বটে! আমিও দু'একদিন দেখেছি বুড়িমা।

আমরা তৎক্ষণাৎ কাঁটা হয়ে দীপুব দিকে ঝুঁকে পড়লুম। সবাই ব'লে উঠলো, কোথা দিয়ে পিশাচ আসে?

দীপু বললে, কেন, খুব সোজা রাস্তা! শ্যাওড়াতলার ওদিক থেকে এসে পশ্চিম দিকে যায়···ওই তোমাদের কানাচ দিয়ে···

তুমি যেতে দেখেছ দীপু?

দীপু হেসে বললে, কতদিন!

দিদিমা কাকুতি ক'রে বললেন, দীপু, তুমি বাবা ভূতপ্রেত তাড়াও আমার বাড়ী থেকে। কত খরচ লাগবে বলো, আমি দেবো।

দীপু বললে, ভূত তাড়াবার খরচ অল্পই বুড়িমা···তবে পিশাচ বলছেন কিনা···ওটাই একটু বেগ দেবে!

তবু কত পড়বে, বাবা ?—দিদিমা ব্যাকুল হয়ে বললেন।

দীপু বললে, এই ধরুন না, ভূতের দাম যদি দু টাকা লাগে, পিশাচ মারতে অন্তত দশ টাকা…

দিদিমা তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বললেন, আমি তাই দেবো দীপু, তুমি আমার বাড়ী থেকে ভূত তাড়াও বাবা…

দিদিমার কাছ থেকে পাঁচ টাকা অগ্রিম নিয়ে দীপু সেদিনকার মতো চ'লে গেল। আমরা অনেকটা স্বস্তি বোধ করলুম!

পিশাচের শরীর নেই, আর ভূত হোলো নাকি ছায়া। ভূতরা দেওয়ালে নাচে, আর পিশাচের কান্না শোনা যায় গভীর রাত্রে। মাঝে মাঝে আমরা তন্দ্রার ঘোরে গোঙানি কান্নাও শুনতে পাই। কল্পনায় দেখতে পাই শ্যাওড়াতলার ওদিক থেকে পিশাচ বেরিয়ে চলেছে পশ্চিম দিকে। আমাদের বাড়ীর কানাচ দিয়ে…অন্ধকার থেকে অন্ধকারে…মাঝপথে সে থামলো, আর ছাগলের মুণ্ডটা কড়মড়িয়ে সে বেশ চিবোচ্ছে আমরা কান পেতে শুনতে পাই, আমাদের দরজাটা কাটছে আস্তে আস্তে—এবার সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকবে!

দীপু সেদিন এসে বললে, বুড়িমা, পূজোর একখানা শাড়ী চাই, পিতলের একটা হাঁড়ি, একটা লোটা ··

দিদিমা বললেন, এসব কি হবে বাবা ?

দীপু বললে, এসব যজ্ঞির কাজে লাগবে। আর একজোড়া রূপোর খাড়ু। আড়াইসের ছাতু—

দিদিমা কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, অনেক খরচ বৈকি ··

দীপু বাঁকাচোখে দিদিমার দিকে তাকিয়ে বললে, তবে এক কাজ করা যাক বুড়িমা,—এত খরচ না ক'রে বরং ভূতটাকেই আগে তাড়াই ; পিশাচটা এখন থাক্—

দিদিমা ব্যস্ত হয়ে বললেন, না, না, বাবা···ভূত, পিশাচ ছুটোই সরাও, সব খরচ আমি দেবো।

দীপু বললে, তবে এই অমাবস্যের আগেই এগুলো আমার চাই, সামনের শনিবার···মনে থাকে যেন !

এই ব'লে খুশী হয়ে দীপু চ'লে গেল।

কিন্তু মামা দীপুকে বেশ ভালো ক'রেই চিনতেন। মামার ধারণা, দীপু আমাদের সবাইকে ভূতের ভয় দেখিয়ে টাকাকড়ি আর জিনিষপত্র কৌশলে আদায় ক'রে নিচ্ছে। দিদিমা বললেন, বেশত, যদি বাড়ী থেকে ভূতটা চ'লে যায়, তাহলে দীপু এসব নিক্ না কেন ?

মামা বললেন, দীপু হোলো চোরের সর্দার, ও ভূতের কি জানে ?

দিদিমা বললেন, চোরের সঙ্গে ভূতের আড়াআড়ি—দীপু ঠিক ভূত তাড়াতে পারবে, তুই দেখে নিস।

মামার কথাটা একেবারে কিন্তু মিথ্যে নয়। কৌশলে টাকা আদায় ক'রে নেবার ক্ষমতা দীপুর অদ্ভুত। পাড়ায় হয়ত মেয়ের বিয়ে হোলো, কিন্তু পরদিন দীপু কোথা থেকে এসে বরের

পক্ষের কাছে থেকে গ্রামভাঁটির টাকা আদায় করলো। কোথাও মারামারি বেধেছে, দীপু গিয়ে মিটমাট ক'রে অপরাধীর পক্ষ থেকে দু'পাঁচ টাকা আদায় ক'রে আনলো। কোথাও খুনজখম হয়েছে পুলিশের লোকে দীপুর ঘরে এলো তদন্ত করতে। কাবুলীওয়ালা সুদ আদায় করতে এলেই দীপুর সঙ্গে তাদের বিবাদ বেধে যেতো। আর সামনে ওই লালার দোকানে তেল নুন নিয়ে দীপুর সঙ্গে ঝগড়া লেগেই থাকতো।

দিদিমা দীপুর হাতে দিলেন রূপোর একজোড়া খাড়ু, একটি পিতলের হাঁড়ি ও লোটা, রাঙাপেড়ে শাড়ী—আরো কত কি। দীপু খুশী হয়ে বললে, চোর আসবে, ডাকাত আসবে কিন্তু ভূত আর পিশাচ কোন দিন আসবে না, বুড়িমা—

দিদিমা দীপুকে আশীর্বাদ করলেন।

শনিবার অমাবস্যার রাত্রের জন্য আমরা অপেক্ষা ক'রে রইলুম। দীপু কত সাহসী তাই ভাবছিলুম। সে ভূত আর পিশাচ মারবে—যাদের কেউ কোনদিন মারতে পারে নি। দীপু বীর, দীপু মহাপুরুষ। শনিবারদিন রাত্রে আকাশ মেঘলা টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। মামা আর দিদিমা জেগে চুপ করেছিলেন। কখন ভূত আর পিশাচ আসবে এবং দীপু কোথায় ব'সে ওৎ পেতে রয়েছে আমরা কিছুই জানিনে। শুধু জানি আজ কিছু একটা কাণ্ড ঘটবেই; অবশেষে ঘটলোও তাই। রাত ঠিক কত বলা কঠিন! হঠাৎ একটা লোহার যন্ত্রের

তীব্র ঝন্‌ঝনে আওয়াজ, তা'র সঙ্গে পিশাচের তীব্র আর্তনাদ। দেখতে দেখতে ছুটোপাটি শব্দ, দেখতে দেখতে লাঠির আওয়াজ। মামা আর দিদিমা উঠে পড়লেন, আমরা আলো জ্বালালুম। দীপু হাঁক দিল, বুড়িমা···শিগ্‌গির...একটা মারা পড়েছে— দু' চারটে পালিয়ে গেল...আমার হাতে রক্ত মাখামাখি—

দিদিমা ওপর থেকেই গলার সাড়া দিয়ে বললেন, তুমি দীর্ঘজীবী হও বাবা—

মামা কি যেন সন্দেহ ক'রে শুধু বললেন, হুঁ!

পরদিন ভোরবেলা দীপু এসে বললে, কোনো ভয় নেই, আমি সব কটাকে মেরে তবে ছাড়বো বুড়িমা—

দিদিমা বললেন, কেমনতরো দেখতে বাবা?

সে আর বলবেন না, বুড়িমা...গায়ে কাঁটা দেয়—ইয়া ল্যাজ... দীপুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা সবাই ভয়ে জড়োসড়ো। কিন্তু ধন্য দীপু! ভূতপ্রেত দানব দস্যু—সবাই দীপুর কাছে জব্দ। দীপু যতদিন আছে, আমাদের কোন ভয় নাই। একদল ডাকাত আসুক, দীপুকে দেবো লেলিয়ে,—অমনি সব ঠাণ্ডা!

সেদিন থেকে মাঝে মাঝে রাত্রে কেমন একটা ঝনাৎ ক'রে লোহার আওয়াজ হয়, তারপর লাঠালাঠি। বুঝতে পারি, আজ দু'একটা ভূত কিংবা পিশাচ দীপুর হাতে মারা পড়লো। আমরা স্বস্তিবোধ করতুম। এই ভাবে দলে দলে ভূতপ্রেত মারা পড়তে থাকে।

যত দূর যাই

মামা একদিন সন্দেহক্রমে গোয়েন্দাগিরি করতে গেলেন। অন্ধকারে কানাচের জানলায় মামা ওৎ পেতে ব'সে রইলেন। হঠাৎ গভীর রাত্রে দরজার ওপারে ঝনাৎ ক'রে লোহার শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে একটা জন্তুর কাতর আওয়াজ, আর ঝট্পট্ শব্দ। মামা তক্ষুণি দরজা খুলে ফেলে আলো জ্বালালেন।

দেখলেন লোহার যাঁতিকলে একটা বুড়ো ইঁদুর পড়েছে। ইঁদুরটা ছট্ফট্ ক'রে প্রায় মরতে বসেছে। আমরা সবাই হতবুদ্ধি! তবে কি দীপুর সমস্তটাই ধাপ্পা? ভূত নয়, পিশাচও নয়,—ইঁদুরগুলোই এসে রোজ রাত্রে দরজা কাটবার চেষ্টা করে? দীপুর ঘরের কাছে গিয়ে রাগে আগুন হয়ে, মামা হাঁকলেন, দীপু! এই দীপু—

দীপু তখন ঘরের মধ্যে নেশা ক'রে অঘোরে ঘুমিয়ে রয়েছে। একটু আধটু সাড়া দিল, কিন্তু উঠে এলো না। বোঝা গেল, নেশা করে সে আজ ইঁদুর-কল্‌টা সরিয়ে ফেলতে ভুলে গিয়েছে! দিদিমা বললেন, কালই আমি দীপুকে পুলিশে দেবো! এত বড় ফাঁকি? ধাপ্পা দিয়ে টাকা আদায় করা!

পরদিন শোনা গেল, দীপু দেশে চলে গেছে।—কিন্তু তাকে পুলিশে দেওয়া আর হয়নি।

এতকাল পরে যদি কেউ প্রশ্ন করে, কেমন ক'রে তুমি লেখক হ'য়ে উঠলে—তবে এক নিশ্বাসে জবাব দেওয়া কঠিন। যারা লেখক তারাই লেখক, সাহিত্যক্ষেত্রে এই বিচার কেউ মেনে

নেয় না। এমন অনেক পণ্ডিত আছেন, যাঁদের লেখার অনেক দাম, যাঁদের লেখায় অনেক জ্ঞানবুদ্ধির কথা, কিন্তু রস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা কল্‌কে পান না। আবার অল্পশিক্ষিত এমন লেখক আছেন, যাঁরা কথায় কথায় রসের শিল্প তৈরী করেন, এবং উঁচু দরের পণ্ডিতদের চেয়ে তাঁদের যশ অনেক বেশী! সত্যকার লেখক যাঁরা, তাঁরা বুঝতে পারেন—না লিখে তাঁদের উপায় নেই, না লিখলে তাঁদের চলবে না, লিখতে পারলে তবে তাঁরা সুস্থ বোধ করেন। কালি-কলম-কাগজ না পেলে তাঁরা নখের আঁচড়ে লিখবেন দেয়ালে, কিংবা নিজের শরীরের মাংসের ওপর। লিখলে তবে তাঁদের মুক্তি।

আমি হিজিবিজি লিখতে ভালবাসতুম। আমার ইস্কুলের খাতা ভরে উঠতো, কলম ভোঁতা হয়ে যেতো। ওই হিজিবিজির মধ্যে এক একটা কঠিন চমক লাগানো কথা এসে যেতো—ওটা যে আমার কথা, এতে বিস্ময় বোধ করতুম। তারপর ভালো কথা-গুলো বেছে সাজিয়ে খাতায় টুকে রাখতুম। অনেকদিন পরে খাতাপত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে সেই রচনা যখন চোখে পড়তো —তার থেকে যেন আরো কিছু আবিষ্কার করতুম। লেখক হয়ে উঠবো একথা কোন কালে আমি কল্পনাও করিনি; ছাপা অক্ষরে আমার নাম হাজির হবে, এ কথা স্বপ্নের অতীত ছিল। ছাপার অক্ষরে যাদের নাম দেখতুম, মনে হতো তারা যেন অপর কোনো গ্রহলোকের জীব, তারা এ জগতের নয়! আমা-

দের ইস্কুল বয়সে পাঠ্য বই কাগজ ছাড়া আর কিছু পড়ার হুকুমও ছিল না, বাইরের বইপত্রের সংখ্যাও ছিল এখনকার তুলনায় অনেক কম। এ সব নিয়ে চর্চাও শুনতুম না। ইস্কুলে আমাদের ক্লাসে বাংলা মাস্টারের কৃপায় একবার একখানা হাতে লেখা মাসিক পত্র আরম্ভ হোলো। বইখানার নাম রাখা হোলো—বানী! মাস্টার মশাই হুকুম করলেন, প্রত্যেক ছাত্রকে কুড়ি লাইনের মধ্যে এক একটি রচনা বানিয়ে লিখতে হবে, আর তা'তে সব চেয়ে দামী মনের কথা থাকবে! মনের সে-বয়সে আমার কিছুই ছিল না, সুতরাং হিজিবিজি যা খুশি তাই লিখে গেলুম। বেশ জানতুম লাঞ্ছনা আছে কপালে, কারণ, মাস্টার মশাই ছিলেন রগচটা লোক। কিন্তু আশ্চর্য, পরের মাসে আমাকে ওই হাতে-লেখা মাসিকের সম্পাদক করা হোলো, কেন না, সব চেয়ে ভালো লেখার পুরস্কার ছিল ওই সম্পাদকের গদিটা। লেখাপড়ার জন্য পুরস্কার আমি কোনো কালেই বিশেষ কিছু পাইনি, সুতরাং ওই গদির অধিকার পেয়ে কী উত্তেজনা আমার,—তিন দিন ধরে কাঁপুনি আর থামে না! বলা বহুল্য, আমার সেই লেখাটায় কোনো পটুতাই ছিল না! আজ দুঃখ হয় সেই মাস্টার মশাইটির জন্য। পণ্ডিত মশাই আমাদের ক্লাসে সংস্কৃত পড়াতেন। আমাদের সংস্কৃত শেখানোর চেষ্টাকে আমি অত্যাচার ব'লে মনে করতুম,—অতএব ওই পণ্ডিত মশায়ের ওপর কিছু একটা পাল্টা অত্যাচার

না করতে পারলে আমার যেন আর কিছুতেই স্বস্তি হোতো না,—কৌশলও হাতে ছিল অনেক। পণ্ডিত মশাই ছিলেন বৃদ্ধ কিন্তু স্বাস্থ্যবান এবং রাগী লোক। অথচ ভিতরে ভিতরে ছিলেন কোমল এবং স্নেহশীল। হঠাৎ যে দিন তিনি মারা গেলেন, বুঝতে পারলুম ইস্কুলের সর্বাপেক্ষা সদাশয় ব্যক্তিটি বিদায় নিলেন। তাঁর জন্য শোকসভা হবে,—ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমায় কিছু লিখে পড়তে হবে—এই ফরমাস এলো। এতকাল পরে প্রকাশ করতে লজ্জা পাই, অমিত্রাক্ষর ছন্দে আমি একটি কবিতা লিখে ফেললুম। শোক-সভার আগের দিন, —সারাদিন নাওয়া-খাওয়া নেই,—অন্তত এক দিস্তে কাগজ খরচ করে কবিতাটা লিখলুম। কোথায় শেষ হোলো, কোথায় গিয়ে খেই হারালো, সে কথা এখন আর মনে নেই—তবে প্রথম দু'চার ছত্র আজো মুখস্থ আছে—

"আজি কি রে বার্তা এক ইরম্মদরূপে
সবার হৃদয় মথি হানিল মরমে।
কালের সাগরে তুলি' কল্লোল উচ্ছ্বাস,
দেবতা-বাঞ্ছিত ভূমি আমার ধামে
পশেছে পুরুষ এক—"

অত লোকজন আর শিক্ষকদের সামনে কবিতাটা পড়তে গিয়ে আমি ঠক্ ঠক্ ক'রে কেঁপেই অস্থির। কিন্তু ওই

কবিতাটা কী খ্যাতি! বেশ মনে পড়ে সারাদিন অভিধান খুলে রেখে 'ইরম্মদ' শব্দটা কী কষ্টেই আবিষ্কার করেছিলুম! ঘটনাটা পঁচিশ বৎসর আগেকার। ওই বয়সটায় কবিতা লেখার বাতিক আমাকে কেমন করে যেন পেয়ে বসেছিল! আমার দিদিমা রামপ্রসাদের গান ভালবাসতেন। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে চেষ্টা করতে লাগলুম, রামপ্রসাদের মতন শ্যামাসঙ্গীত লিখতে। মনে মনে বেশ একটা অভিভাব হয়েছে, হয় ত লিখতে বসেছি—কিন্তু পদ্যের অক্ষর গোণা কিংবা মিল খুঁজে বা'র করা—ওইটেই ছিল আমার পক্ষে কষ্টকর। মিল খুঁজতে গিয়ে সারাদিন হায়রান,—মনটা যেন হাহাকার করতে থাকে। অনেক সময় মিল নেই—আমি ঝরঝর করে সিঁড়ি ভেঙে লিখে যেতুম। সেটা না হোতো গদ্য রচনা, না হোতো কবিতা। আজ্‌কালকার মতন গদ্য কবিতা সেকালে থাকলে আমি সাহস পেতুম বৈকি! আমার সেই পদ্যরচনা, সেই বদ্‌অভ্যাস কেটে গেল—যখন থেকে রবিঠাকুরের কবিতা পড়া আরম্ভ করলুম। ভাবলুম আর যাই হোক, এই অপচেষ্টা আর কোনদিন করবো না। মনে মনে কামনা করলুম, রবিঠাকুর ছাড়া আর যেন কেউ কবিতা না লেখে!

বেশ মনে পড়ছে সেটা অসহযোগ আন্দোলনের সময়। বাইরে নানা গণ্ডগোল, আমি মাঝে মাঝে চুপ করে ঘরে বসে থাকি। কোন কিছু ভাল লাগে না, সুতরাং

কতকগুলি গল্পের বই এনে পড়তে থাকি। গল্প পড়তে গেলেই আমার মনে প্রশ্ন উঠতো, এটা ওরকম না হয়ে এরকম হোলো কেন? মেয়েপুরুষের চরিত্রগুলোকে লেখকের হাতের পুতুল মনে হোতো। লেখকের ইচ্ছা অনিচ্ছা খেয়াল-খুশিতেই তারা যেন নাড়াচড়া করে,—তারা নিজেরা যেন স্বাধীন নয়, রক্তমাংসে গড়া নয়। লেখক আনে তাই তারা আসে; তা'রা নিজেরা হেঁটে আসে না। লেখকই তাদের হাসায়-কাঁদায়, তাদের নিজেদের স্বাধীনতা নেই। সে সব গল্প পড়তে অনেক সময় হয়ত ভালো লাগতো, কিন্তু কেমন একটা অভাব বোধ করতুম। ফলে লেখকরা তাঁদের গল্প যেখানে শেষ করতেন, আমার কল্পনা আরম্ভ হোতো সেইখান থেকে। এমনি করতে করতে একদিন বুঝতে পারলুম, আমার মনেও কিছু কথা আছে। চেয়ে দেখলুম আমাদের চারপাশে যে পৃথিবীটা বাস্তব চেহারা নিয়ে প্রখর দিনের আলোয় জেগে রয়েছে ওই লেখকেরা যেন সমস্তটা অস্বীকার ক'রে চঁদের আলোর চশমা চোখে নিয়ে কাহিনীগুলো লিখে গেছে। আমার মন দিন দিন কেমন যেন প্রতিবাদ করে উঠেছিল। অমি যেন একটা পথ খুঁজছিলুম।

আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কী ছাইভস্ম লিখি, তাই জানবার জন্য বাড়ীর লোকের কী অসীম কৌতূহল! মা একদিন প্রশ্ন করলেন, কাগজকলম নিয়ে হিজিবিজি কী করিস?

আমি বললুম,—একটা গল্প লিখছি। গল্প !—মা একেবারে ভয়েই অস্থির। তাঁর ছেলে বুঝি এবার উচ্ছন্নে গেল! পরদিন তিনি গেলেন আনন্দময়ী তলায়। ঠাকুরের দরজায় মাথা খুঁড়ে জানালেন, ছেলের সুবুদ্ধি দাও মা। সকালবেলা পাছে লিখতে বসি, এজন্য আমাকে নানা ফাই-ফরমাসে ব্যস্ত রাখা হোতো! রাত্রে পাছে কাগজকলম নিয়ে বসি, এজন্য অনেক সময় বড় বৌদি বলতেন, দুটো হারিকেনের চিম্‌নিই আজ ভেঙে গেছে, ভাই।—প্রশ্ন করতুম, তাহলে আমি লিখবো কেমন করে ?—তিনি বলতেন, যত লিখছ ততই ছিঁড়চ লিখে তবে লাভ কি ?—তা বটে, আমি চুপ করে যেতুম।

কিন্তু গল্প আমাকে লিখতেই হবে, নৈলে আমি যন্ত্রণা বোধ করি সুতরাং অপরাহ্নের দিকে রোদ একটু কমলে আমি চ'লে যেতুম নারকেলডাঙ্গা পেরিয়ে শিয়ালদার রেলপথের উপর। সেখানে একটি সাঁকোর শানবাঁধানো জায়গায় একা বসে লিখতুম, কিংবা লেখার কথা ভাবতুম। আমি থাকতুম উঁচুতে, মাঝে মাঝে পাশ দিয়ে ট্রেন চ'লে যায়,—আর নীচের দিকে নিত্যদিনের পরিচিত লোক-যাত্রা দেখা যেতো। সেই একলা নির্জনে আমার কল্পনাজগতের ছেলেমেয়েরা যেন মানুষের শরীর নিয়ে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কথা বলে যেতো। সমস্ত দিন ধ'রে যত লোক দেখতুম, যত চেহারা আর প্রকৃতি আমার জানা থাকত—এখানকার নির্জনে ব'সে তাদের ভিতরের আসল

মানুষটিকে দেখতে পেতুম। ওদিকে আমি আবার গরীব গেরস্থ ঘরের ছেলে, উপার্জনের বয়সে এসে পৌঁছতে আর দেরি নেই,—সুতরাং সে কথাটাও মন থেকে তাড়াতে পারিনে। কিন্তু সব কিছু ভুলে কেবল গল্প লেখার কথাই ভাবতে ভাল লাগতো। প্রায় লেখকরা সাধারণতঃ গল্প অথবা কবিতা লিখতে গিয়ে প্রণয়কাহিনী দিয়ে আরম্ভ করে। আমি কোন প্রণয়কাহিনী ভাবতে পারতুম না। আমার ভালো লাগতো ভাই, বোন, বন্ধু, আদর্শবাদী, স্বার্থত্যাগী,—এদের নিয়ে কল্পিত কাহিনী লিখে যেতে, ঐতেই আমি আনন্দ পেতুম। গল্প লেখার জন্যই গল্প লেখা—এই চলতি বুলি আমার ভাল লাগতো না। যে গল্পটা শুধু নিছক একটা গল্পই হোলো, তা'র থেকে আর কিছু পাওয়া গেল না—তেমন গল্প ছিল আমার দু'চোখের বিষ। একটা আদর্শ, একটা ব্যঞ্জনা, একটা কোন দুরূহ ভাবনার পথ—এ যদি সব গল্পের মধ্যে জড়িয়ে না থাকে, তবে গল্প লিখে লাভ কি? আর একটা কথা ওই সময় আমার মধ্যে ছিল। আমি বড়লোক নিয়ে কিছু লিখতে পারতুম না। আমি লিখতুম মজুর, জেলে, রাজমিস্ত্রী, গাড়োয়ান, মুদি, ফড়ে —এই সব নিয়ে, কারণ তাদের জীবনযাত্রাটা চোখে দেখতুম। তাদের নিয়ে গল্পের ইন্দ্রজাল সহজেই বুনতে পারতুম। কোথাও অনাচার ঘটলো, কেউ বিনা রোগে মারা গেলো, কেউ অহেতুক অপমানে নুয়ে পড়লো—অমনি আমার গল্প লেখা সুরু।

নিছক আর্টের আনন্দ বিতরণ করবো, ফুল, চাঁদ, লতা, মৌমাছি আর বিরহ-মিলন নিয়ে কাহিনী ফাঁদবো—এ আমি কোন-কালেই ভাবতে পারিনি। আমি ভাবতুম মানুষের হৃদ্‌পিণ্ডের রক্তের ধারা যে লেখায় ছোটেনি, তাকে কিছুতেই সাহিত্য সৃষ্টি বলা চলবে না। আমি সেজন্য পথে ঘাটে গল্প খুঁজে বেড়িয়েছি—স্টিমারঘাটে, চটকলের ধারে, রেল ষ্টেশনে, বিদেশের ধর্মশালায়, মফঃস্বলের ওয়েটিং রুমে, তীর্থপথের মেলায় —আমি গল্পের বিষয়বস্তু খুঁজে পেতুম। এক-আধজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে এক আধটা কাঁচাহাতের গল্প কখনো কখনো শুনিয়েছি কিন্তু তারা বলতো, ওসব ছোটলোকের কথা লিখো না, লোকে নিন্দে করবে! তাদের কথা শুনে আমি ভয়ে ভয়ে সে সব লেখা ছিঁড়ে ফেলতুম। মনের জোর ছিল কম, ইচ্ছার জোর তার চেয়েও কম।

কোনদিন কোনো লেখা নিয়ে আমি সম্পাদক অথবা প্রকাশকের কাছে যাইনি! ভয় ছিল, পাছে কেউ মুখের ওপর 'না' বলে। সে অপমান কিছুতেই আমি সইতে পারবো না, এই ছিল আমার বিশ্বাস। ছাপা অক্ষরে নাম বা'র করার জন্য দৈন্যপ্রকাশ করতে আমি মোটেই রাজি ছিলুম না। সেইজন্য গল্প লিখে ঘরেই জমিয়ে রেখে দিতুম, আর হয়ত মাস তিন চার পরে সেইগুলোতে আগুন ধরিয়ে তা'র সামনে চুপ ক'রে ব'সে থাকতুম। যে সব মেয়েপুরুষকে অত যত্নে আগ্রহে

বুকের রক্ত দিয়ে গড়েছি,—তা'রা সবাই চোখের সামনে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, সে দৃশ্য মন্দ লাগতো না। মাঝে মাঝে অন্ধকার রাত্রে আমার ঘরের সামনেকার ছাদে অসংখ্য কাহিনী দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে—আর আমি সেই শ্মশানের রাঙা আলোয় দেখে নিচ্ছি পাড়াপল্লীর ঘর বাড়ির বস্তি প্রতিবেশীর নিঃসাড় নিশুতি ঘুম! এর ভেতর থেকে আমি একটা অর্থ খুঁজে পেতুম।

সম্পাদকদের কাছে যাইনি বটে, তাদের নামে ডাকে লেখা পাঠাতুম। দুপুরবেলা সবাইকে লুকিয়ে পোষ্ট অফিসে গিয়ে বুকপোষ্টে লেখা পাঠাতুম—লেখা অমনোনীত হলে ফেরৎ পাবার জন্য ডাকটিকিট সঙ্গে দিতুম। তার পরদিন থেকে কী অধীর অসহ্য প্রতীক্ষা আমার! বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতুম পথের দিকে তাকিয়ে—কখন ডাকপিওন আসবে। দু'দিন, তিনদিন, চারদিন, সাতদিন—সময় আর আমার কাটে না! হয়ত ডাকপিওন এলো, হয়তো আমার বাড়ীতে চিঠিও দিল, কিন্তু আসল বস্তুর খোঁজ নেই। লেখাটা ছাপা হবে এ আশা করতুম না,—কিন্তু লেখাটা ফেরৎ এলে যেন সকলের অগোচরে সেটা নিয়ে লুকিয়ে ফেলতে পারি, এই জন্যই দাঁড়িয়ে থাকতুম। ঠিক তাই হোতো, লেখা ফেরৎ আসতো! আমি সেই অভিশপ্ত রচনার দিকে আর ফিরেও তাকাতুম না। সে লেখা যথাসময়ে চিতার আগুনে উঠতো।

ভাবতুম কোনোমতে আমার একটা লেখা ছাপা হ'লে আর আমাকে পায় কে? আমার খ্যাতি ছড়াবে দেশ-দেশান্তরে, জনসাধারণের মুখে মুখে আমার নাম, সকালে উঠে বড়লোকেরা চায়ের আসরে ব'সে আমার স্তুতিবাদ করবে, কত লোক খোঁজ নেবে, কত মাল্যচন্দন জুটবে.—আর আমি বিজয়ী বীরের মতন নিরাসক্ত হাসিমুখে চুপ ক'রে থাকবো। সুতরাং সেইটুকু বর্ণনা ক'রে আমি আমার কাহিনী শেষ করব।

লেখা পাঠাই, আর ফেরৎ আসে। টিকিট দিলেও অনেক লেখা কোনোদিনই আর ফেরৎ আসে না। একদিন কিন্তু এক মজার ঘটনা ঘটলো। ডাকপিওন এসে একখানি মাসিকপত্র আমার হাতে দিয়ে গেল। এই মাসিকের নাম কোনোদিন শুনিনি, এর সম্পাদকের নামও আমার জানা ছিল না। কিন্তু কাগজটি খুলে হঠাৎ দেখি, আমার নামে আমারই একটি গল্প ছাপা হয়েছে! সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করে উঠলো উত্তেজনায়, কাঁপতে লাগলুম ঠকঠক ক'রে। কোনদিন এ কাগজে লেখা পাঠাইনি অথচ কেমন ক'রে আমার গল্প ছাপা হোলো? আমাকে গৌরব এনে দিল বটে, কিন্তু বোকা বানিয়ে দিলো—মনে পড়ে গেল আমার এক বন্ধুর কাছে গোটা তিন চার লেখা বছরখানেক আগে তা'র বাড়ীর লোকদের পড়তে দিয়েছিলুম, ওগুলোর কথা ভুলেও গিয়েছিলুম—এ লেখা তাদেরই একটি। না, ভুল নয়, মিথ্যে নয়, স্বপ্ন নয়—এ

যত দূর যাই

আমারই লেখা বটে। কিন্তু কী কাঁচা লেখা, কী বাজে গল্প! সে লেখা কেউ পড়েছে কেউ ভালো বলেছে—এ খোঁজ আমি পাইনি। সে লেখা ডুবে তলিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, সে কাগজের নামও ভুলে গেছি। দেখতে দেখতে কয়েকটা লেখা বেরোলো, কিন্তু কোনো খ্যাতিই হোলো না, কেউ নাম করলো না, ধীরে ধীরে বুঝতে পারলুম, ছাপা অক্ষরে নাম বেরোনো কী মিথ্যে। কী মূল্যহীন! তখন প্রশ্ন উঠে দাঁড়ালো, কেন আমি লিখি? এতদিন ধ'রে সেই প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে চলেছি।—

ছোড়দিদি লিখেছিলেন, এবার বদ্যিনাথে এসে আমার এখানে নিশ্চয় উঠবি, ধর্মশালা কিংবা হোটেলে কিছুতেই তোকে থাকতে দেবো না। মনে রাখিস।

সুতরাং বৈদ্যনাথে গিয়ে দিদির ওখানেই উঠেছিলুম। প্রায় পাঁচ ছয় বছর পরে দেওঘরে এসেছি, এখন এখানকার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো। সম্প্রতি অল্প অল্প শীত পড়েছে।

ছোড়দিদির বাড়ীটি বাজারের কাছেই, প্রায় রাস্তাটার মোড়ে। এখান থেকে মোটর বাস ছাড়ে,—কোনোটা মধুপুর, কোনোটা দুমকার ওদিকে যায়। কয়েকদিন দেওঘরে থেকে দুমকার দিকে যাবার ইচ্ছে আছে। আমি সেই সময়টায় কোনো এক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ক্যানভাসার নিযুক্ত হয়েছিলুম। ছোড়-দিদির স্বামী এখানে ডাক্তারি করেন, তাঁর নিজের একটি ডিসপেন্সারি আছে। উপার্জন মোটামুটি মন্দ নয়।

বাসার মধ্যে ঢুকে যখন আমার আদর অভ্যর্থনা চলছে, সেই সময় লক্ষ্য ক'রে দেখলুম একটি কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে ছোড়দিদির সাংসারিক কাজকর্মে সর্বপ্রকারে সাহায্য করছে। মেয়েটি যেমন সুশ্রী তেমনি লাজুক। এতই লাজুক যে, আমি নিজেও খানিকটা জড়োসড়ো হয়ে গেলুম। এক সময় ছোড়দি বললেন, এখানকার ঝি-চাকর একেবারে নবাব,

একটা কাজ সেরে সারাদিন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে···চুলের টিকিটিও দেখবার জো নেই। সব কাজ আমি ভাই পেরে উঠিনে। বললুম, ও মেয়েটি কে?

ছোড়দি হেসে বললেন, ওমা, ও আমাদের লাবণ্য। এই পাশের বাড়ীর চৌধুরী মশায়ের মেয়ে। লাবণ্যর জন্যেই ত আমার সংসার চলে, ভাই। কুটনো, বাটনা, জল, পান, বিছানাপাটি—সবই ও আমার হাত থেকে কেড়ে নেয়। মেয়েটা আমার গায়ের পোকা।

ছোড়দিদির তিনটি ছেলেমেয়ে আমাকে পেয়ে বসলো। ওদের জন্যে কলকাতা থেকে খেল্‌না এনেছিলুম। বড় মেয়েটির নাম মঞ্জু, বছর দশেক বয়স,—এখানেই কোন্ ইস্কুলে সে লেখাপড়া করে। মেজ মেয়েটির নাম রুমি। এবার পরীক্ষায় উঁচু জায়গা পেয়েছে। ওদের সেই সব প্রাইজের বই দেখতে দেখতে আমার সকাল বেলাটা কেটে গেল। ছোড়দির ছেলেটির নাম বাটু, বছর ছয় সাত বয়স,—নিজেই এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে ভাব ক'রে বললে, আজ বিকেলে যদি তাকে নন্দন পাহাড়ের দিকে না নিয়ে যাই, তবে রাত্রে সে কাঁচি দিয়ে আমার মাথার চুল কেটে দেবে।

ওঘর থেকে ছোড়দি ধমক দিয়ে উঠলেন এবং লাবণ্য ভাঁড়ার ঘরে ব'সেই খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। কিয়ৎক্ষণ পরে ছোড়দি বেরিয়ে এলেন; হেসে বললেন, এতদিন বাদে তুই

এলি, কি ভাগ্যি বলেনি—মামার মাথা ন্যাড়া ক'রে ঘোল ঢেলে দেবো!

লাবণ্যর হাসির শব্দ আবার কানে এলো। মঞ্জু বললে, বাটুরা ছেলেমানুষ, ওরা যাক্ নন্দন পাহাড়ে,—আমাকে কিন্তু একদিন ত্রিকুটে নিয়ে যেতে হবে—হ্যাঁ।

বললুম, ত্রিকুটের দিকে বাঘ বেরোয়, তা জানিস?

রুমি বললে, এঃ বাঘ! বাবার বন্দুকটা নিয়ে যাবেন?

বাটু বললে, বাবা কি বলেছে জানেন মামা? আমি বড় হয়ে হাতীর পিঠে চ'ড়ে শিকার করতে যাবো।

ওঘর থেকে লাবণ্য এবার বললে, বাটু, তোর বাবাকে হাতীর ল্যাজে বেঁধে জঙ্গলে নিয়ে যাস. কেমন?

বাটুর মনে এই পরিহাসটি কোথায় আঘাত করলো, কে জানে। সে চেঁচামেচি ক'রে হৈ চৈ বাধিয়ে বললে, মাসিমা, ভালো হবে না কিন্তু।

লাবণ্যকে আমি যতটা সলজ্জ এবং আড়ষ্ট মনে করেছিলুম ততটা সে নয়। আমি যেন অনেকটা স্বস্তি বোধ করলুম। কিন্তু কোনো কৌতূহল প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসঙ্গত এবং অশোভন। দু'পা এগিয়ে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ছোড়দির সঙ্গে গল্পগুজব করবার নামে লাবণ্যর কাছে দাঁড়িয়ে তাকে দেখা শোনা—এটাও মনে মনে অপছন্দ করলুম। কোনো প্রয়োজন কিংবা কোনো উদ্বেগ আমার নেই।

কিছুক্ষণ পরে ছোড়দি একরাশি খাবার আমার জন্যে তৈরি ক'রে নিয়ে এলেন। খাবারের থালা দেখেই ছোড়দির সুসভ্য ছেলেমেয়েরা আড়ালে চ'লে যাবার চেষ্টা করতেই আমি মঞ্জু আর বাটুকে ধ'রে ফেললুম। বললুম, ভারি পাকা হয়ে উঠেছিস, না? বোস এখানে?

ছোড়দি বললেন, ওই যা—মিষ্টির থালাটা আন্‌তো লাবণ্য। জল আনিস। লাবণ্য মিষ্টির থালা ও জল এনে হাজির করলো। তারপর বললে, চা দেবো ত?

বললুম, হ্যাঁ, চা আমার চাই। তুমি এই মিষ্টির থালাটি তুলে নাও ছোড়দি। মিষ্টি আমি পরে খাবো।

লাবণ্যর মুখের চেহারাটি আমি দেখিনি, তবে তার হেঁট হবার সময় মাথা থেকে রাশীকৃত এলোচুল মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়তে দেখলুম। লাবণ্য চা আনতে চলে গেল।

শেখরবাবু আমার মানসম্ভ্রম রেখে কথা বলেন না, আমাকে তুই-মুই করেন। তাঁর ডিসপেন্‌সারি বাসার খুব কাছে, সুতরাং কাজের এক ফাঁকে এসে তিনি বললেন, ধর্মের ষাঁড় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস ত?

বললুম, আজ্ঞে না, রোজগার ক'রে খেতে হয়। এ আর ডাক্তারি নয় যে, নিমোনিয়ার ভয় দেখিয়ে ম্যালেরিয়ার মিক্‌শ্চার চালাবো!

শেখরবাবু হো হো ক'রে হাসলেন। বললেন, কই রে লবণ, চা আন্ রে।

লবণ !

হ্যাঁ, হ্যাঁ লবণ !—শেখরবাবু বললেন, আরে পৃথিবীতে সব চেয়ে মিষ্টি হোলো লবণ !—দে শিগগির চা দে···আমার রুগী রয়েছে ব'সে।

লাবণ্য একসময় দুই পেয়ালা চা এনে কাছে রাখলো। তারপর চ'লে যাবার চেষ্টা করতেই খপ ক'রে শেখরবাবু তা'র হাতখানা ধরলেন। বললেন, ঠুঁটো বদ্যিনাথের দেশে কেমন সোনার প্রতিমা দেখেছিস ?

শেখরবাবুর অসভ্যতার জন্য আমি মুখ তুলতে পারলুম না। তিনি হেসে বললেন, লবণ বেশী হয়নি ত ?

লাবণ্য সলজ্জ হয়ে বললে, না। আঃ হাত ছাড়ুন !

শেখরবাবু বললেন, ভালো কথা···বরের চিঠি পেয়েছিস ?

সহসা লাবণ্য সোজা হয়ে দাঁড়ালো। প্রশ্নটাকে সে যেন গ্রহণ ক'রে নিল অতি সহজে, সানন্দে। তারপর বললে, হ্যাঁ পাবো ··আগামী সপ্তাহে।—কণ্ঠে তার কোনো জড়তা, অথবা কিছু মাত্র লজ্জাভাস নেই !

লাবণ্যর মুখের দিকে এবার আমি তাকালুম। শান্ত দুটো চোখ ঃ কিন্তু ঠিক কালো নয়—একটু কটা। সেই চোখের তারায় দেখা যায় যেন দেওঘরের শ্যামল প্রান্তরের একপ্রকার

বন্যতা। একপ্রকার আত্মবিস্মৃত ভাবনায় সে-দৃষ্টি অনেকখানি নির্লিপ্ত। অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলুম।

ওঘর থেকে ছোড়দি কি যেন ব'কে উঠলেন। শেখরবাবু লাবণ্যর হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বললেন, আচ্ছা যা—

আশ্চর্য, লাবণ্য আরো কিছু বলবার জন্য যেন প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ছোড়দির গলা পেয়ে সে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। এবার ছোড়দি বেরিয়ে এলেন। বললেন, হোলো ত? তোমাকে নিয়ে আব পারিনে। ওই যে ঘরে গিয়ে ঢুকলো ···ত্বঘণ্টা ওকে দিয়ে আর কাজ পাবো না! এই তাড়াতাড়ির সময়···যাও, বেরোও দিকি বাড়ী থেকে! আড্ডা পেলে আর কিছু চাও না।

শেখরবাবু হাসিমুখে অনেকটা যেন বেয়াকুবের মতো বেরিয়ে গেলেন।

বললুম, কি ব্যাপার ছোড়দি?

আমার ভাই যত জ্বালা।

গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলুম, ও মেয়েটির স্বামী থাকেন কোথায়?

ছোড়দি বললেন, স্বামী! সে অনেক কথা—পবে শুনিস ভাই!—বলতে বলতে তিনি চ'লে গেলেন। আমার চোখে মুখে এমন একটা সবিস্ময় কৌতূহল ছিল যে, নিজের লজ্জায় নিজেই আমি সেখান থেকে উঠে চ'লে গেলুম। বাস্তবিক, স্বামীর আলোচনায় লাবণ্য যে ভাবে সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে

আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিল, তা'তে আমি সত্যিই অবাক্ হয়ে গেছি।

আমি নিজের থেকে ছোড়দিকে আর কোনো প্রশ্ন করিনি। লাবণ্য সম্পর্কে আমার কোনোরূপ সামাজিক কৌতূহল প্রকাশ পায়, এ আমি চাইনে। যদি সহজে কেউ কিছু বলে ত শুনবো, নৈলে একদিন চুপ ক'রেই চ'লে যাবো,—এইটি ভেবে রেখেছি।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা ক'রে রাখি, এক সময় স্ত্রীলোকরাই প্রত্যেকটি ধারণা ভেঙ্গে তচনচ করে দেয়। প্রথম এ বাসায় ঢুকে লাবণ্যকে যা মনে করেছিলুম সে একেবারেই তা'র বিপরীত।

শেখরবাবু আর ছেলেমেয়েদের খাবার পর, আমি আর ছোড়দি একত্র খেতে বসবার আগে ছোড়দি প্রশ্ন করলেন, লাবণ্য তুমি বসবে কোথায়?

লাবণ্য বললে, কেন, তোমাদের কাছে খেতে বসলে কি অন্যায় হয়?

ধন্যি মেয়ে তুই। নে, আয় তবে—

আমরা তিনজন। ত্রিকোণাকার হয়ে থালার সামনে বসলুম। ছোড়দি এবার মস্ত সমারোহের সঙ্গে পারিবারিক গল্প আরম্ভ ক'রে দিলেন। আমার সেদিকে মন ছিল না, আমি লক্ষ্য করছিলুম লাবণ্যকে। সে নিশ্চিন্ত ভাবে আমাদের গল্পে যোগ

দিয়ে বেশ ক্ষুধার্ত ভাবেই খেতে লাগলো। এক সময় আমি বললুম, ছোড়দি অত তরকারি আমি খেতে পারবো না।

ছোড়দি বললেন, ওমা, অত কি রে? মাত্র চারখানা মাছ—

লাবণ্য বললে, খেতে পারবো না বললেই হোলো! এদেশে মাছ তেমন পাওয়া যায় না। ছোড়দি অত কষ্ট ক'রে আনালো, আর তুমি কিনা খেতে পারবে না। ওকথা আমরা শুনবো না।

তুমি! আমি অবাক্ হয়ে একবার লাবণ্যের দিকে তাকালুম। আমার মুখে যেন বক্তোচ্ছ্বাস উঠে এলো। এত নতুন পরিচয়ে এমন ঘনিষ্ঠ সম্ভাষণ আমি স্বপ্নেও কল্পনা করি নি। আমি অভিভূতের মতো চুপ ক'রে রইলুম। ছোড়দি ঈষৎ হেসে খেতে লাগলেন।

একসময় ছোড়দি বললেন, যাদের বিয়ে হয়েছে তারা চিরদিনই মাতব্বর আর বয়সে বড়; আর বিয়ে যাদের কোনোকালে হয়নি, তারা যতই বুড়ো হোক, তা'রা ছেলে-মানুষ!

লাবণ্য বললে, ঠিক বলেছ ছোড়দি···এই যেমন তোমার ভাইটি!

ছোড়দি বললেন, ওরে পোড়ারমুখী, তুই আমার কথাটাই বেঁকিয়ে ব'লে দিলি, কেমন?

লাবণ্য একবার আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো। ছোড়দি বললেন, তুই এখানে লাবণ্যর খাওয়া দেখে অবাক হচ্ছিস, না রে, ও আমার এখানে সমস্ত দিন থাকে, রাতে চ'লে যায়! ওর মা ভাই বোন কেউ নেই। শুধু ওর বাবা চৌধুরী মশাই থাকেন—কিন্তু তাঁর এখানে কাপড়ের দোকান। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তিনি দোকানেই থাকেন, দোকানেই খান্। ঝি একজন থাকে বাড়ীতে। লাবণ্য ছাড়া আমার ঘরকন্না কিছুতেই চলে না।

বললুম, সে ত' দেখতে পাচ্ছি।

আহারাদির পর পানের রেকাব হাতে নিয়ে লাবণ্য আমার ঘরে এলো। ব্যস্ত হয়ে আমি বললুম, পান আমি খাইনে।

লাবণ্য স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, বিয়ের পর যখন সংসার পাতবে তখন পানের খরচ কমিয়ো, এখন খেতেই হবে।

বাধ্য হয়ে হাসিমুখে আমি দুটো পান তুলে নিলুম। লাবণ্য রেকাব নিয়ে চ'লে গেল। সত্যি বলতে কি, সে কাছাকাছি এলে আমি যেন একটু আড়ষ্ট বোধ করি। তা'র চোখে ওই বন্যতাটা লক্ষ্য করার পর থেকে আমার গা যেন কেমন ছম ছম করে। তা'র স্বাস্থ্য অত্যন্ত পরিপুষ্ট, তা'র বাতাসে কেমন একপ্রকার মদির গন্ধ,—আমার তুলনায় সে অনেকখানি ছাড়ালো। সে কথা কইলেই আমার একটা

পরাজয়ের মনোভাব প্রকাশ পেতে থাকে। বাস্তবিক, আমি তা'র সঙ্গে পেরে উঠবো না।

পরবর্তী কয়েক দিন ধ'রে আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেওঘরের এখানে ওখানে ভ্রমণ ক'রে বেড়াতে লাগলুম। একদিন গেলুম মন্দিরে, একদিন বিকালের দিকে নন্দন পাহাড়ের প্রান্তরে, একদিন বালানন্দ স্বামীর আশ্রম মন্দিরে —এই ক'রে কাটলো। ত্রিকূটে আমরা সবাই মিলে অভিযান করলুম এবং আমি ও ছোড়দি যখন মন্দির ও গুহা দেখে নানা আলোচনা করছি, সেই সময় লক্ষ্য ক'রে দেখলুম যত অগম্য আর দুরারোহ স্থান আছে, লাবণ্য বেছে বেছে সেই জায়াগাগুলিতে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাথরে সে পা কেটেছে, কাঁটায় কাপড় ছিঁড়েছে, টাল সামলাতে না পেরে প'ড়ে গিয়ে কাদা মেখেছে। ছোড়দি তা'র চেহারা দেখে বললেন, ও অমনিই। বন-জঙ্গল পাহাড় নদী দেখলে ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়। একদিন দেখি ভিজে মাঠে শুয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে! বললে, কী ভাল লাগে ভিজে ঘাসের গন্ধ!

সেদিন লাবণ্য যে চেহারা নিয়ে হাসতে হাসতে আমাদেব সঙ্গে ফিরে এলো, লোকালয়ে সে-চেহারাটা প্রকাশ পাবার মতো নয়। আমি তা'র প্রকৃতি লক্ষ্য ক'রে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলুম।

ছোড়দির কাছে শুনেছিলুম, লাবণ্য রোজ রাত্রে আলো

জ্বেলে অনেকক্ষণ অবধি লেখাপড়া করে। তা'র নাকি ঘুম হয় না কোনোদিন। সুতরাং দীর্ঘ রাত পর্যন্ত জেগে সে নিজের মনে নানাপ্রকার পড়াশোনা করে। কিন্তু বাপের বাড়ীতে সে থাকে কেন, শ্বশুরবাড়ী কেন যায় না, তা'র ছেলেপুলে হয়েছে কিনা—এ সমস্ত কৌতূহল আমার নেই এবং আমি কোনও প্রশ্নও করিনি। কিন্তু তার শরীরের হিন্দুস্থানী বাঁধন দেখে মনে হয়, ছেলেপুলে যতই হোক না কেন, এ স্বাস্থ্য শীঘ্র ভেঙ্গে পড়বার মতো নয়। লাবণ্য কঠিন ক'রে হাঁটতে জানে,—চলাফেরা আনাগোনায় তা'র অখণ্ড স্বকীয়তা ; তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য দেখতে পাই পদে পদে। সে কাছে এসে দাঁড়ালে ভয় করে, কিন্তু চোখের আড়ালে থাকলে কেমন একটা দুর্বোধ্য আকর্ষণ বোধ করি।

দুপুরবেলা মঞ্জুরা বাড়ী থাকে না, তা'রা ইস্কুলে যায়। শেখরবাবু দুটি ভাত মুখে দিয়ে সেই-যে দিবানিদ্রা দেন, বেলা পাঁচটা পর্যন্ত আর তাঁর সাড়াশব্দ থাকে না। ছোড়দি জেগে আছেন, তবে তিনি তাঁর নিজের ঘরে কাপড় জামা গোছানো নিয়ে ব্যস্ত। আমি একখানা বাসি সংবাদপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলুম। ঠিক এমনি সময়টায় লাবণ্য দোতলার একান্তে আমার এই ঘরটিতে এসে ঢুকলো। চেয়ে দেখলুম, তা'র হাতে এক গাদা বই, কাগজ। হাতে একটা ফাউণ্টেন্ পেন্। ভিতরে ঢুকে সে বললে, বিরক্ত করতেই এলুম।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, না না, বিরক্ত আর কি—

লাবণ্য সেই জিনিষপত্রগুলো নিয়ে আমার পাশে বেশ গুছিয়ে বসলো। তারপর বললে, ছোড়দি বলছিল তুমি নাকি শিবের মন্ত্র খুব ভালো ক'রে পড়তে পারো?

হেসে বললুম, দিদি এখানে না থাকলে সেটা প্রমাণ হবে কেমন ক'রে?

সে বললে, আচ্ছা ঠিক ক'রে বলো ত, তুমি পড়াশুনো করেছ কতদূর?

আমি বললুম, মুখে বললে বিশ্বাস হবে না। আমাকে পরীক্ষা করলে মেটোমুটি একটা উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

লাবণ্য বললে, আমি খুব ভালো ইংরেজি পড়তে জানি, তা জানো?

এবার জানলুম—এখন থেকে ভয়ে ভয়ে থাকবো।

ও, আমাকে বুঝি ঠাট্টা? আমি বুঝি ঠাট্টা শোনার জন্যে এলুম?

হেসে বললুম তবে আমার বিদ্যেটাও শুনিয়ে দিই। এই দেওঘরের মধ্যে আমি সবচেয়ে ভালো বাংলা পড়তে পারি।

লাবণ্য বললে, বাংলা লিখতে পারো?

একটু একটু।—ব'লে হাসলুম।

লাবণ্য খাতাপত্র নাড়াচাড়া ক'রে বললে তুমি শুনলে অবাক্ হবে, আমি বাংলা একটুও লিখতে জানিনে। তাই জন্যেই এলুম তোমার কাছে।

মানে—বাংলা শিখতে ?

না, তা নয়। তুমি আমাকে একখানা চিঠি লিখে দাও !

বললুম চিঠি ? কা'র কাছে ?

লাবণ্য বললে, আমার স্বামীর কাছে। লক্ষ্মীটি, বেশ ভালো ক'রে লিখো। এই নাও কাগজ···এই কলম—

আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠলুম ! স্বামীর কাছে স্ত্রী চিঠি লিখবে—তা'র ভাষাই আলাদা। সেটা গোপন—ব্যক্তিগত। তাছাড়া এই যুবতী মেয়ের চিঠি, এর চিঠিতে নানাবিধ অপ্রকাশ্য কথা থাকবে—সেটা আমার হাত দিয়ে লেখা হয় কেন ?

মুখে বললুম, আমার দ্বারায় কি সম্ভব ? বরং ছোড়দি লিখে দিতে পারেন। ওঁকে দিয়ে লেখানোই ভালো।

লাবণ্য বললে, উনি মধ্যে মাঝে লিখে দেন, তবে আমার সব কথা লিখে দিতে চান না—কেবল আমাকে তামাসা করেন।

এতদিন পরেও বেশ মনে পড়ে, লাবণ্যর কথা শুনে আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল। কিন্তু সে যেভাবে এসে জায়গা জু'ড়ে বসেছে, তা'তে সে যে আমাকে রেহাই দেবে এ আমার কিছুতেই মনে হয় না। সুতরাং শুধু আমি বললুম, আচ্ছা, ব'লে দিলে যা হোক ক'রে লিখে দিতে পারবো।

আমি বলে দেবো ?—বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে লাবণ্য

বললে, এই তুমি ভালো বাংলা জানো, অথচ একখানা চিঠি লিখতে জানো না ?

বললুম ভালো বাংলাও জানি, একটু আধটু লিখতেও বোধ হয় পারি, কিন্তু স্ত্রী কোন্ ভাষায় স্বামীকে চিঠি লেখে ওটা আজো জানিনে।

আচ্ছা হয়েছে, নাও—এবার আরম্ভ করো।

লাবণ্যর শাসনে আমি কাগজখানা গুছিয়ে কলমটি বাগিয়ে ধরলুম। কি ভাষায় সম্ভাষণ লিখবো তাই ভেবে উঠতে পাচ্ছিনে। কয়েকটা শব্দ আছে, কিন্তু স্বহস্তে কেমন ক'রে তা'র একটি লিখবো—তাই ভেবে আকুল হ'য়ে উঠলুম !

লাবণ্য ঝুঁকে পড়েছে কাগজখানার উপর। সে দেখতে চায় কেমন ক'রে একটি শব্দ আমি বসাই, আমার হাতের অক্ষর কেমন। তা'র চোখে একাগ্র, একান্ত, তীব্র দৃষ্টি ! তা'র নিশ্বাসটা পড়ছে আমার হাতের উপর,—হাতখানা যেন ঝলসে যাচ্ছে। তা'র ঘন চুলে, তা'র গ্রীবায়, তা'র সর্বশরীরে এমন একটা আরণ্যক গন্ধ জড়ানো যে, কোনো অক্ষর বসাবার আগে আমার হাতের আঙ্গুলগুলো কাঁপতে লাগলো। আমি ঢোক গিলে মৃদু কণ্ঠে বললুম, ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে কিভাবে আরম্ভ করবো। আচ্ছা,—শ্রীচরণেষু লিখবো ?

মানে ?—লাবণ্য এবার মাথা তুললো। পুনরায় বললে,

পায়ের তলায়? তুমি কি আমাকে এত ছোট মনে করো? আমি কি চিঠি লিখে তা'র পায়ে ধরেছি?

লাবণ্যর গলার আওয়াজে আমি চমকে উঠলুম। এমন কঠিনভাবে সে আমার দিকে তাকালো যে, আমার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা সরলো না। আমি হকচকিয়ে নতমুখে চুপ ক'রে রইলুম।

কিন্তু লাবণ্য তা'র অনবদ্য দেহখানি বাঁকিয়ে পুনরায় তদ্রূপ কণ্ঠে বললে, একথা মনে রেখো মেয়েরা মন ভোলাতে জানে, কিন্তু ভিক্ষে চাইতে জানে না!

বললুম, কিন্তু তিনি যে স্বামী!

হোন স্বামী! আমি কি চাই—আমাকে দেখে সেটা বুঝে নিতে হবে। আমি পায়ে ধ'রে কাঁদতে পারবো না, একথা মনে রেখো।

তা হ'লে এই চিঠি লেখার মানে কি?

লাবণ্য হেসে এবার বললে, চিঠি লিখি—লিখতে ভালো লাগে তাই। তা'কে দেখিনি অনেকদিন, সে প্রিয়, সে এসে এখানে দাঁড়াক—তাইত' চিঠি লেখা! তুমি যে বিয়ে করোনি, তাই বুঝতে পারো না—স্বামী কাছে না থাকলে স্ত্রীর কি হয়! কত আদরের, কত আনন্দের·········কত বড় আশ্রয় সে! তুমি বুঝবে না কিছু,—তুমি যে আজো একলা—তুমি যে শূন্য!

তা'র উচ্ছ্বাসে আমি একবারে দিশাহারা হয়ে গেলুম। কোনো মেয়ে এমন ক'রে বিগলিত ভাষায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে, এটি আমার কাছে অভিনব। আমি চেয়ে দেখলুম, লাবণ্যর চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। তা'র কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তা'র সর্বাঙ্গেও যে একটি কাঁপনের দোলা লাগছিল, এও লক্ষ্য করছিলুম।

লাবণ্য এবার বললে এবার বুঝতে পারলে ত কী লিখতে হবে? যা বললুম সব মনে রেখো।—আচ্ছা, আজকে তোমার মন নেই। বেশ, আর এক দিন গুছিয়ে সব লিখে দিয়ো—কেমন?

বললুম, বেশ তাই হবে।

কবে যাচ্ছ তুমি?

এই সামনের শুক্রবারে।

তা'র আগে লিখে দিয়ো কিন্তু নইলে ছাড়ব না।—এই ব'লে সে তা'ব বই কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল।

আমার চোখের সামনে সংবাদপত্রখানার উপরে বাসনার স্ফুলিঙ্গগুলি ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

যাবার দিন সকালে মঞ্জু আর রুমিদের নিয়ে আমি দেওঘরের মাঠে ঘাটে অনেকখানি ঘুরে বেড়িয়ে এলুম। হেমন্তের রৌদ্রে আর শিশিরে সুন্দর হয়ে উঠেছে দেওঘরের মাঠ। আমি

স্থির করেছি, এখান থেকে ট্রেনে যশিডি হয়ে মধুপুর যাবো—সেখান থেকে মোটরে দুমকা। সেই আমার সুবিধা। মঞ্জুরা ইস্কুল থেকে ফিরলে ওদের সঙ্গে দেখা ক'রে তবে ট্রেনে উঠবো। আমার ট্রেণ বেলা পাঁচটার পর।

শেখরবাবু আমার কাছে বিদায় নিয়ে বেলা এগারোটার ট্রেনে চ'লে গেলেন যশিডি—সেখানে তাঁর কল্ আছে। মঞ্জুরাও ইস্কুলে বেরিয়ে গেল বাড়ীর চাকরদের সঙ্গে। আমার জিনিষপত্র সকাল থেকেই ছোড়দি গুছিয়ে রেখে-ছিলেন।

দুপুর বেলা কণ্টকিত হয়ে যে কথা ভাবছিলুম, ঠিক তাই। সেদিনকার মতো আজো কাগজ কলম নিয়ে লাবণ্য আমার ঘরে এসে দাঁড়ালো। হাসিমুখে বললে, আজ সকালে একজন গণৎকার কি ব'লে গেছে জানো?

মুখ ফিরিয়ে তা'র দিকে তাকালুম। লাবণ্য বললে, আমার স্বামীর চিঠি আসবে আজ কালের মধ্যে।

স্বস্তি বোধ ক'রে বললুম, তবে আর চিঠি লেখানো কেন? আগে সেই চিঠি আসুক?

বারে, যদি না আসে? যদি গণৎকারের কথা মিথ্যে হয়? —এই ব'লে সে কাগজ-কলম নিয়ে আমার পাশে বসলো। পুনরায় বললে, সে হবে না। তুমি গেলে আবার কে লিখে দেবে? নাও, শিগ্‌গির লেখো।

বললুম, আবার ত সেই সম্ভাষণ-সমস্যা ?

আচ্ছা বেশ, ওটা আমি ছোড়দিকে দিয়ে লিখিয়ে নেবো। তুমি আরম্ভ ক'রে দাও।

কলম হাতে নিয়ে বললুম, কি লিখতে হবে শুনি।

লাবণ্য বললে, লেখো—তুমি রাগ ক'রে কেন চ'লে গেলে ? আমাকে কি একটুও মনে পড়ে না ? এমন কি কিছু নেই, যা তোমাকে ভুলিয়ে আমার কাছে এনে দেয় ?

কলমটা বাগিয়ে তাড়াতাড়ি খসখস ক'রে লিখতে যাবো, এমন সময় ছোড়দি দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমার গা ঘেঁসে লাবণ্যর বসবার এলায়িত, ভঙ্গীটি ছোড়দির ভালো লাগলো না। তিনি কঠিন কণ্ঠে বললেন, লাবণ্য, তোকে না আমি মানা করেছি ?

লাবণ্য আর আমি দুজনেই ছোড়দির দিকে তাকালুম। ছোড়দি বললেন, তোকে কতবার বলেছি, এসব আমি ভালোবাসিনে ? ওকে দিয়ে বাজে চিঠি লেখাতে কে তোকে বলেছে ? ন্যাকামি করগে যা নিজের ঘরে গিয়ে, আমার ভাইয়ের ঘরে ঢুকেছিস কেন ? যা, বেরো ঘর থেকে—

আমি কোনো অন্যায় করিনি ছোড়দি—বলতে বলতে লাবণ্য কাগজ-কলম নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমি অত্যন্ত লজ্জায় প'ড়ে গেলুম।

লাবণ্য এবাসা থেকে বেরিয়ে সটান নিজের বাড়ীতে গিয়ে

ঢুকলো। তা'র বাড়ীতে লোকজন কেউ নেই, শূন্য বাড়ীটা খাঁ খাঁ করছিল। ভিতরে গিয়ে সে উচ্চকণ্ঠে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো—আমরা এবাসা থেকে শুনতে পাচ্ছি। প্রলাপ জড়িত কণ্ঠে সে চিৎকার করছে, :আমি কোনো অন্যায় করিনি ছোড়দি—কোনো অন্যায় আমি করিনি, আমাকে মিথ্যে ক'রে তুমি বকলে কেন······

ছোড়দি বললেন, মাস তিনেক আগে আমার দেওর এসে-ছিলেন দুদিনের জন্যে বেড়াতে·········তাকে নিয়েও মেয়েটা এই কাণ্ড বাধিয়েছিল। আমি কত বার মানা করেছি···ওই যে, শুনছিস ?

কি ?

ওই যে মাথা ঠুকছে দেওয়ালে গুম্‌গুম্ ক'রে ?

বললুম, ওর স্বামী এসে ওকে নিয়ে যায় না কেন, ছোড়দি ?

ছোড়দি আমার দিকে ফিরে বললেন, স্বামী! ওর আবার স্বামী কো'থায় ?

কী বলছ তুমি ?

ঠিকই বলছি। ওর এখনো বিয়েই হয়নি। স্বামী না ছাই! হঠাৎ ভূমিকম্পের মতো ন'ড়ে উঠে আমি স্তব্ধ হয়ে ছোড়-দির দিকে তাকিয়ে রইলুম। ছোড়দি বললেন, ওর বাপের ব্যবসাদারির জন্যেই ওর জীবনটা মাটি। বর বিয়ে করতে এসেছিল, কিন্তু সম্প্রদানের আগে চৌধুরী মশাইয়ের

ইতরোমের জন্যেই বরপক্ষের লোক বরকে তুলে নিয়ে চ'লে গেল। মেয়েটার সেই থেকেই মাথার দোষ।

বললুম, কই, ওর মাথার দোষ ত চোখে পড়ে না?

ছোড়দি বললেন, হ্যাঁ, সব সময়েই ভালো···তবে ওই স্বামী বলতেই পাগল। ওর ধারণা ওর বিয়ে হয়েছে···স্বামী রাগ ক'রে আসে না! ডাক্তার বলে, ওর মাথার একটা শির নাকি মচ্‌কে গেছে।

কতক্ষণ পরে আমি বললুম, কিন্তু আমার জন্যে এ কি হোলো, ছোড়দি? আমি যে তোমার সঙ্গে ওর মনোমালিন্য বাধিয়ে দিলুম! আমিই উপলক্ষ্য!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছোড়দি লাবণ্যর ঘরখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, মনোমালিন্য? কিছু না! ঘণ্টা দুই বাদে ও আবার হাসিমুখে আমার কাছে আসবে। কিন্তু তার আগে ও নিজের চুল ছিঁড়বে, ঘরের জিনিসপত্র ভাঙবে,— তারপর নখ দিয়ে আঁচড়ে নিজের গা থেকে রক্ত বা'র করবে। ···এই···এই লাবণ্য······ছোড়দির ডাক লাবণ্য শুনতে পেলো না। সে তখন ঘরের মধ্যে দাপাদাপি আরম্ভ করেছে। ছোড়দি উৎকণ্ঠার সঙ্গে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি ছোড়দির দিকে চেয়ে হঠাৎ বললুম, লাবণ্য না হয় চেঁচিয়ে কাঁদছে, তোমার চোখে জল কেন, ছোড়দি?

এমন সময় হুটোপাটি ক'রে মঞ্জুরা ইস্কুল থেকে ফিরে

এলো। এবার আমার যাবার সময় হয়েছে। বেলা সাড়ে চারটে বাজে।

ছোড়দি আমার কথার জবাবে ধীরে ধীরে বললেন, এত ভালো···তবু এত কষ্ট পাচ্ছে। ওকে বেশী বক্‌লে আমার নিজের ব্যথা লাগে। পোড়া মেয়েমানুষের মন।

লাবণ্য তখনও ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। নিজের দেহের উপর উৎপীড়ন করতে করতে বলছে, আমি···আমি কোনো অন্যায় করিনি···তবু···তবু রাগ ক'রে চলে গেল! তবু সবাই আমাকে—

আমি সেখান থেকে স'রে গেলুম। নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী ব'লে মনে হ'তে লাগলো। লাবণ্যর এবারের কান্নার জন্য আমিই ত' দায়ী!

বেশ মনে পড়ে, সেবার ভারাক্রান্ত মনে দেওঘর ত্যাগ করেছিলুম।

বাড়ীটি অনেক দিনের পুরনো। পূব দিগের অংশটা বরাবরই ভাঙ্গা, তা'র ওদিকে পড়ো জমিটিতে অনেককাল থেকে স্তূপাকার ইঁট জমা রয়েছে। আর দক্ষিণে আমাদের চির পরিচিত বেলগাছটি,—ওটায় আমাদের বহুকালের ভাবনা আর কল্পনার প্রলেপ জড়ানো। এ-বাড়ীর শিরা উপশিরার সঙ্গে আমাদের সকলের অন্ত্রতন্ত্র অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। আমাদের দুঃখে বাড়ীটাও কাঁদে, আমাদের সকলের আনন্দে সেও খুসী হয়ে হাসে।

অনেকদিন থেকে একটা কথা শোনা যায়, এই সম্পত্তিটি নাকি কোথায় কোন্ রায়েদের কাছে বাঁধা দেওয়া আছে। শতকরা অত টাকা সুদ, সেই সুদ নাকি কোন কালেই দেওয়া হয় না,—এবং আসল পরিশোধ করার কোন আলোচনাই কোনদিন শোনা যায় না। সুতরাং সুদ ও আসল মিলিয়ে টাকার অঙ্কটা প্রতিমাসে বাড়তেই থাকে; দুর্ভাবনা ও উদ্বেগ প্রতিমাসেই তাদের করাল চেহারা নিয়ে একবার এসে হাজির হয়। এ বাড়ী গেলে আমাদের দাঁড়াবার জায়গা কোথাও নেই,—কোন্‌দিকে কোথায় আমরা সবাই ছিন্নভিন্ন হয়ে ভেসে যাবো, তা'র কোনো খোঁজ খবর থাকবে না।

বাড়ীতে ভাড়াটে আসে, কিছুকাল থাকে, আবার তারা একদিন বাড়ী ছেড়ে চ'লে যায়। কতগুলো ভাড়াটে এলো,

এখন আর আমার মনে পড়ে না। তবে শূন্যপুরীর নৈঃশব্দ্যের দিকে তাকালে মনে হয়, অগণ্য ইতিহাসের জটলা ওর ঘরে-ঘরে কন্দরে পঞ্জরে করুণ কলরব করছে,—আমরা কেবল তাদের ভাষা কানে শুনতে পাইনে, এই যা। ভাড়াটেদের এতদিন ধ'রে দেখে এসেছি, আমরা নিজেরা যে কোনদিন ভাড়াটে হ'তে পারি, এ কথা কল্পনাও করিনি। ভাড়াটেরা এসেছে, নির্দয়ভাবে এ বাড়ীর প্রত্যেকটি ব্যবহার করেছে এ আমরা দেখে এসেছি। কোন ভাড়াটে চ'লে যাবার সময় দরজা-জানলাব কপাট ভেঙেছে, কেউ দেওয়াল ভেঙে পেরেক্ পুতেছে, কেউ কালি-ঝুলি মাখিয়ে রেখে গেছে, সেই দৃশ্য দেখে আম্মাদেব চোখে কান্না এসেছে। তা'রা বুঝতে পারেনি, এ বাড়ীর উপরে প্রত্যেকটি আঘাত আর অনাচার—আমাদেরই বুকের উপর দাগ রেখে চ'লে গেছে। এ বাড়ী আমাদের পরমাত্মীয়,—এর অপমান আমরা সইতে পারিনে।

মামা মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, যেমন কর্ম তেমন ফল! টাকা ধার করবার বেলায় মনে ছিল না। ভিটে মাটি চাটি! এবার চোর-বাগান কিংবা চাষাধোপাপাড়া,—সেখানে গিয়ে থাকো।

দিদিমা ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তুই যা—তোকেই ওসব পাড়ায় মানাবে! যা একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সেই চুলোয় থাকগে যা—

মামা বললেন, আমি না হয় ঘর ভাড়া নেবো—ঘড়ি সারাবার কাজ করি,—আমাদের চলে যাবে। তোমরা? তোমরা দাঁড়াবে কোন্ আঘাটায়?

দিদিমা বললেন, বলি, তার জন্যে তোর অত মাথাব্যথা কেন?

মাথাব্যথা হবে না? আমার বাপের সম্পত্তি কিভাবে তুমি নষ্ট করো, তাই আমি দেখতে চাই—

দিদিমা চিৎকার ক'রে উঠলেন, খবরদার, তুই মুখ সামলে কথা ক'স—এ সম্পত্তি আমার স্ত্রীধনে কেনা—আমার যা খুশি তাই করবো—

মামা বললেন, স্ত্রীধন? স্ত্রীধন এলো কোত্থেকে? এঃ স্ত্রীধন?

তুই বেশী কথা বলবিনে আমার সামনে দাঁড়িয়ে—খবরদার।—দিদিমা পুনরায় হাঁক দিলেন, অমন করলে কানাকড়ি দিয়ে যাবো না,—তোকে আমি পথের 'বেগার' ক'রে যাবো।

মামা চ'লে যাবার সময় বললেন, আমিও হাইকোর্টে নালিশ ঠুকতে জানি। তোমার ওই জাল-উইলের ধাপ্পাবাজি আমি সব বা'র ক'রে দেব!

অর্থাৎ এই কলহ-বিবাদের ভিতব থেকে একটা কথা সহজেই বুঝতে পারতুম, মামার চরিত্র ভালো ছিল না, সেই কারণে দিদিমার নামে ছিল সমস্ত সম্পত্তি,—এবং সেটা স্ত্রীধনে

খরিদ করা, এইটির প্রমাণ রাখা হয়েছিলো। যাই হোক, মাতা পুত্রের এই অপরূপ সম্পর্ক আমাদের সকলের কাছেই উপাদেয় ছিল। আমি একান্তে দাঁড়িয়ে দুজনের কথাগুলি গলাধঃকরণ করতুম!

কিন্তু আমরা সবাই যে একটি সঙ্কটকালের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছি, এটি সকল সময়েই বুঝতে পারা যায়। বাড়ীটি কিছুতেই থাকবে না, দেনার দায়ে একদিন শীঘ্রই বিক্রী হয়ে যাবে, আমাদের চ'লে যেতে হবে যেদিকে দুচোখ যায়,—সমস্ত বিরূপ অবস্থাটা পিছন থেকে আমাদের তাড়না করছে,—এটি নিত্যই অনুভব করি। এবাসা ছেড়ে যেতে হবে। একদিন দিদিমাকে কাছে পেয়ে বললুম, দিদিমা— !

দিদিমা বললেন, কেন ভাই ?

এবাড়ী বিক্রী হয়ে গেলে আপনি কোথা যাবেন ?

আমি ? আমার ভাবনা কি, ভাই। আমি যাবো কাশী।

বললুম, আর আমরা ?

অমনি দিদিমা চুপ ক'রে যেতেন। তাঁর চোখে জল আসতো। তিনি আর কথা বলতে পারতেন না। এমন সময় মা এসে দাঁড়াতেন পাশে। শান্ত স্থির বিধবার মূর্তি— বিষণ্ণতা আছে, উদ্বেগ ও দুর্ভাবনা আছে—কিন্তু সেই মূর্তিতে অস্থিরতা কোথাও নেই।

মা বললেন, দর্জিপাড়া আর না হয় ত' বাগমারী,—দুখানা ঘর যেখানেই হোক চাই—

কথাটা ওখানেই থেমে যায়। কেননা, ঘর খুঁজে বেড়াবার অভ্যাস কারো নেই। আমরা ভাড়াটে হয়ে কারো বাড়ীতে আছি, এটা বিস্ময়, এটা নতুন। কে যাবে ঘর খুঁজতে? কে চেনে? কেমন ক'রে বাড়ীওয়ালাদের কাছে দাঁড়াতে হয়? এ সম্বন্ধে এ বাড়ীতে পারদর্শী লোক পাওয়া খুবই কঠিন।

অনেক ভেবে দিদিমা শুধু বললেন, কাশী···কাশী বিশ্বনাথ!

দেখতে দেখতে একদিন রায় মশায় এ বাড়ীতে এলেন। তিনি দেখ্‌তে চান্‌ বাড়ীর অবস্থাটা কেমন। আমরা সবাই আতঙ্কে জড়োসড়ো। যারা টাকা ধার দেয়, সুদ খায়, দেনার দায়ে পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে, তা'রা অত্যন্ত খারাপ লোক—এ ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে! তারা ভাল লোকও হ'তে পারে, এবং দুঃসময়ে টাকা দিয়ে লোকের কাছে অহেতুক বদনাম কিনে বেড়ায়—এ আমরা বিচার ক'রে দেখিনে। আমাদের মনে হলো লোকটি নর-পিশাচ। আমরা তা'কে কিছুতেই ভালো বলবো না—এটি স্থির করে' রেখেছিলুম।

লোকটি ছাদে গিয়ে উঠলো। ঠাকুরঘরের পূর্বদিকে ভাঙ্গা পাঁচিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। দোতলায় এসে ঘরগুলি পরীক্ষা ক'রে বেড়ালো, নীচের তলায় নেমে বাড়ীর

চৌহদ্দি ঘুরে এলো। না, এ আমার দরকার নেই, আমাকে টাকাই ফিরিয়ে দেবেন।

লোকটি চলে যাবার পর আমরা নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। আমাদের পাড়ায় মারোয়াড়ী লালার দোকান ছিল। একদিন লালাদের আত্মীয় একটি লোক এসে হাজির। সে-লোকটি ভিতরে ঢুকলো না, কেবল বড়ীটার চারিপাশে দেখে শুনে যাবার সময় বললে, এর চেয়ে কাপড়ের কারবারে টাকা ঢাললে আমার অনেক বেশী লাভ।

আমাদের স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো।

কিন্তু স্তূপাকার দেনার উপর সুদ বেড়ে উঠছে এমন দ্রুত মাত্রায় যে চুপ ক'রে ব'সে থাকা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এ বাড়ী থাকবে না, একদিন না একদিন যাবেই—তবে তাড়াতাড়ি ক'রে বেচতে পারলে এখনো কিছু কাঁচা টাকা হাতে পাওয়া যায়। তারপর কে কোথায় যাবে বলা কঠিন,—ভবিষ্যৎটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

একজন বৃদ্ধ দালাল প্রায়ই আসে দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে; বাড়ীখানা বিক্রী হ'লে সেই বুড়ো রামবাবু শতকরা দুটাকা দালালি পাবে। আমরা লোকটিকে শকুনি ব'লে ডাকতুম। সে এসে দিদিমার কানে কানে মন্ত্র দিত, ইমারৎ পুরনো হয়েছে, সময় থাকতে এ বাড়ী বিক্রী ক'রে ফেলাই ভালো।

যত দূর যাই

শীতের শেষে বেলগাছটায় নতুন পাতা এসেছে, কোথাও কোথাও আগডালে কাকেরা বাসা বাঁধার চেষ্টায় আছে। বর্ষাকালের সবুজ শ্যাওলা পাঁচিলের গায়ে এতদিনে শুকিয়ে কালো রং ধরেছে। বেলতলাটার ভাঙ্গা ছাদে চড়ুই পাখীর দল কাল–কাকলী ক'রে চ'লে যায়। ওপাশে মিত্তিররা, তাদের পাশে রায়েরা,—এপাশে দূরে সরকারদের বাড়ীটি—লালরংয়ের উঁচু চিলকোঠা এতদূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়। সমস্তটা জড়িয়েই ভালোবাসা। এপাড়ায় যতখানি আকাশ, সবটাই আমাদের পরিচিত। কোথা দিয়ে মেঘ আসে, শরৎকালটা কোন জান্‌লাটা দিয়ে ভালো দেখা যায়, চৈত্রের দুপুরে বেলগাছের ছায়াটা কোন্‌-খানটিতে প'ড়ে ঝিলমিল করে, শীতের হাওয়া কোন্‌ বারান্দা দিয়ে আসে হু হু ক'রে—এসব আমাদের বড় পরিচিত। অগ্রাণ মাসের শেষে মেয়েরা কোথায় রোদ পোয়াতে বসে, কলাইয়ের ডালে হিং মিশিয়ে কোন্‌ জায়গাটিতে বড়ি শুকোতে দেওয়া হয়, উনুনের ধোঁয়াটা কোন্‌ ফাঁকটি দিয়ে আকাশের দিকে উঠে যায়, বাইরের দরজায় কেউ এসে কড়া নাড়লে ঠিক কেমন আওয়াজটি হয়—আমরা সমস্তটাই জানি। এ বাড়ীর অনুপরমাণুর সঙ্গে আমাদের প্রাণ একাকার।

আমাদের বহুদিন আগেকার চাকর ফুলচাঁদ ছাদের সিঁড়ির ওই কোণটিতে ঘুমিয়ে থাকতো; ওটার নাম ছিল ফুলচাঁদের

কোণ। এমনি ছিল তক্তার তলা, মাঝের ফোকর, শেষ নর্দমা, ছোট ঘর, আল্‌সে, মামীর ঘর, পাতাল, সিঁড়ির তলা,— এমনি একটি একটি অংশের নাম। বাড়ীটা ছিল মস্ত জগৎ, অনেক সময় তা'র সীমা খুঁজে পেতুম না। আমাদের ভালোবাসা বাইরেটাতেও ছড়িয়ে থাকে। সরু গলি, সামনে রাস্তার নহরের চাক্‌তি, ওপাশে গঙ্গার মা'র ঘর, তা'র পাশে আস্তাবল, ওধারে পুঁটেদের জায়গা, পিছনে ক্ষিরিনাপতিনির বস্তি, গয়লাপাড়া, ওদিকে সেই পাল্‌কি গাড়ীর আড্ডা— সমস্তটা মিলিয়েই আমাদের ভালোবাসা। কচিদের বাড়ীর পিছন থেকে চাঁদ উঠবে, সেই চাঁদের আলো আগে আমাদের কোন্ জানালাটায় এসে পড়বে আমরা জানি। সন্ধ্যার পরে তিন-তারা উঠবে কোন্ পাঁচিলের পাশে, ঝড় এলে আগে কোন্ দরজটায় ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দ হবে, বৃষ্টির ছাট্ এলে কোন্ জানালাগুলি আগে বন্ধ করা দরকার—এ সবই আমাদের মুখস্থ।

কিছুদিন থেকে একটি লোক এ বাড়ীতে আনাগোনা করে। লোকটির নাম গোপালবাবু। সে জাতিতে সুবর্ণ-বণিক। গলায় তা'র একগাছি সোনার হার, হাতে একটি সোনার চেন্‌পরানো সোনার কবচ, আঙ্গুলে গোটা তিনেক হীরেমুক্তোর আংটি,—কিন্তু ভদ্রলোকটি অতি মিষ্টপ্রকৃতির। পান খায় প্রচুর—তা'র সঙ্গে স্মূর্তি কিংবা জরদা। পায়ে

যত দূর যাই

এক জোড়া নটবর দাস। আমরা বলতুম, টাকার কুমীর।

সকলেই শঙ্কিত হয়ে আছি, পাছে এই লোকটির সঙ্গে কথা পাকাপাকি হয়ে যায়। প্রায়ই দেখি দিদিমা এটর্নির বাড়ীতে যাতায়াত করেন, এবং মামা ভয় দেখিয়ে বলেন, জাল-উইলের জোরে সম্পত্তি বিক্রি করা হচ্ছে—আমি ঠিক হাইকোর্ট করবো! এ-বাড়ীতে আমি ঘুঘু চরাবো,—দারোয়ান ছুটিয়ে তবে ছাড়বো। বলবো, হুজুর, এ বাড়ী আমার! আমার বাপ ফল্লা ভট্‌চার্যির টাকায় এই সম্পত্তি কেনা, আমি ওয়ারিশ ···দেখবে তখন মজাটি! বলে, যার ধন তা'র ধন নয়, নেপোয় মারে দই!

দিদিমা বলেন, যা, যা পারিস, তোর ভারি খ্যামোতা!

সদর দরজাটার ছোট্ট কুলুঙ্গিতে আমি চুপ ক'রে ব'সে থাকি। গরু এসে আঁস্তা-কুড়ের কলাপাতা চিবিয়ে যায়, মাথায় কালো হাঁড়ি নিয়ে দইওয়ালা হাঁকে, দুপুরে চুড়িওয়ালী বেলোয়ারি চুড়ির গোছায় ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজ করে যায়, তা'র সঙ্গে কাঁসারি যায় ঢং ঢং ক'রে কাঁসি বাজিয়ে। আর বিকালের দিকে হেঁকে যায় কেরোসিন তেল! সন্ধ্যার ঠিক আগে হাঁকে চানাচুর-ভাজা আর নকুল দানা, সন্ধ্যায় যায় কেয়াফুল কিংবা বেলফুল, আর রাত্রে হেঁকে যায় কুল্‌পি বরফ। সমস্তটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা—সমস্তটা নিয়ে এই বাড়ী।

আশ্বিনে শরৎকাল এলেই আমাদের মাঝের দরজায় ফকির এসে মধুরস্থরে আগমনী গান গায়,—'কবে যাবে গিরিরাজ আনিতে মোর উমাধনে।'

আমরা অমনি ছুটে বেলতলায় আসি। রৌদ্রে আর পরিষ্কার আকাশে এরই মধ্যে কখন্ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বেলগাছের পাতায় তখনও জলের ফোঁটা,—আর সেই গাছের মাথায় আকাশ ঘন সোনার রৌদ্রে নীলাভ হাসি হাসছে। আর ওই দূরে ঈশান কোণ ছাড়িয়ে আসছে গিরিরাজ—শুভ্র মেঘের জটা,—হাঁসের পালকের মতো শাদা। শরৎ এসেছে··· পূজার আভাস পাওয়া যায় সোনার রোদে, সবুজ ছায়ায়, নীলের মায়ায় আর শাদা মেঘের প্রবাহে। মাঝের দরজায় ফকিরের গান তখনও দূরদূরান্ত অবধি ভেসে চলে—'কবে যাবে গিরিরাজ······'

আসল কথা এই বাড়ীর পাঁচিলে দাঁড়ালেই সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি স্পষ্ট দেখতে পাই। দেখতে পাই সবগুলি ঋতুর পরিবর্তনশীলতা। নিজের অস্তিত্বটাকেও দাঁড়িয়ে দেখি এ বাড়ীর বাতায়নের বাইরে। এটা প্রাচীন, এটা অতি পরিচিত, তাই এটা স্থায়ী। চোখে দেখতে পাচ্ছি এটাকে ভেঙ্গে দেবার একটা ষড়যন্ত্র চলছে। প্রাচীন ব্যবস্থাটাকে উচ্ছেদ করবার জন্য নতুন মানুষের দল এসে দরজা ঠেলছে। আমাদের সময় ফুরিয়েছে, কাল পূর্ণ হয়েছে,—এবার চ'লে যেতে হবে; আর

এখানে থাকার অধিকার নেই। ইতিহাসের একটা পর্ব ওল্‌টাবে—তা'র আর দেরি নেই। পোঁটলাপুঁটলি বাঁধতে হবে, মায়ামোহ কাটাতে হবে, নতুনকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে,—আমাদের দিন শেষ হয়েছে।

দিদিমা একদিন আবিষ্কার করলেন, বাড়ীর সব খদ্দেরকেই মামা বাইরে থেকে ভাংচি দিয়ে তাড়িয়ে দেন। একদিন মস্ত বিবাদ বাধলে মাতাপুত্রে। মামা বললেন, এ বাড়ী আমি ছেড়ে যাবো না।

দিদিমা বললেন, পেয়াদা এসে তোকে বা'র ক'রে দেবে—দেখিস।

মামা বললেন, এ বাড়ী আমার। যে-ঢুকবে তাকে কেটে দুখানা করবো।

তাই করিস,—আগে আমরা বেরিয়ে যাই।

সত্য কথা এই, মামা কোথাও নড়তে চান না। অভ্যাস-গ্রস্ত জীবনটাকে বদলাতে মামা কিছুতেই রাজী নয়। তাঁর তামাকের সজ্জা থাকে এককোণে, সেই কোণটি তাঁর বড় প্রিয়। তিনি ঘড়ি সারানোর কাজ করেন জানলার ধারটিতে ব'সে—সেই জায়গাটি যেমন নিভৃত তেমনি নিরাপদ। বেলতলার ছাদে টিনের কানেস্তারায় মামার আছে একটি ডালিমের চারা,—সেটি তাঁর বড় প্রিয়। তামাকটি খেয়ে তিনি সেই রক্তবর্ণ ডালিমফুলের দিকে চেয়ে ব'সে আছেন।

শীতের দিন রৌদ্রে তিনি স্নান করেন ওই ছাদে,—ছাদটি তাঁর কাছে বড় মিষ্ট। একটি বিড়াল আছে—তার নাম পুষি। সেই পুষি বাড়ীর এধার ওধার ছুটে বেড়ায় — বিড়ালটী তাঁর একান্ত আপন। তাঁর ঘরের দেওয়ালটিতে একখানি ছিন্ন-মস্তার পট। মামা বলেন, তিনি নাকি বামাচারী। তাঁর ছাতি আর লাঠি ঝোলানো থাকে একটি হুকে, সেই জায়গাটি অন্ধকারেও তিনি চিনতে পারেন। ঘরটির সঙ্গে তাঁর দৈনিক অভ্যাসগুলি তৈরী, জানলার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা, বারান্দাটির সঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনা ছাদটির সঙ্গে তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা মেলানো। এ সব ছাড়তে তাঁর ভয় করে, দুর্ভাবনা দেখা দেয় এ বাড়ীর আশ্রয়ের বাইরে মরুভূমি ছাড়া তিনি আর কিছু দেখতে পান না। ছেড়ে যেতে বললেই কোথায় যেন টান পড়ে, কে যেন সহস্র বাহু বাড়িয়ে মামাকে এখানে ধ'রে রাখতে চায়।

গোপালবাবুর আনাগোনা সম্প্রতি বেড়েছে। মামার ভাংচিতে মাঝে তিনি এখানে আসা বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু ইদানিং আবার তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। বাড়ীর দাম যেন কত হাজার টাকায় স্থির হয়েছে ; শীঘ্রই বায়না হবে। বাড়ীর মধ্যে যারা বয়স্ক, তা'রা দিদিমার সঙ্গে উকীলের বাড়ী যাতায়াত করছে। আমাদের মন খারাপ, অত্যন্ত খারাপ, আমরা আর আমাদের প্রিয় জায়গাগুলির দিকে তাকাইনে।

যত দূর যাই

নীচেকার ওই ইঁটের খাদ্‌রি-করা কলতলা, সদর দরজার ওই দুটি ফোকর, ওই বেলতলার ছাদ, ছোট ঘরের ওই গলিটী, বারান্দার এক একটি অংশের গণ্ডী নিয়ে আমাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি,—কোনোদিকে আর আমরা ফিরে তাকাতে পারিনে। আমাদের কান্না আসে,—মায়া, মোহ, স্নেহ, আত্মীয়তা,—সবগুলো যেন আমাদের আকর্ষণ ক'রে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে।

সিঁড়ির নীচে কতদিনের ভূতের উপদ্রব, চালাঘরের পাশে কতকালের পিশাচের আনাগোনা, 'বেলগাছের কাছে পার্টিশন-দেওয়ালের আগায় কতদিনের বেহ্মদত্যির চলাফেরা, সমস্তটাই এবার ভালো লাগছে। বিষ্টুবাবুর ছাদের পাশে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে আমরা জ্যোৎস্নালোকে দেখতুম রাজপুত্র সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে রাজকন্যাকে নিয়ে দেশে ফিরছে, হংসরথ আকাশপথে উড়ে চলেছে অযোধ্যায়, চিত্রলেখার পালঙ্ক শূন্যলোকে ভেসে চলেছে,—সবটাই দেখতে পেতুম ওই রেলিংয়ের ধারে গিয়ে দাঁড়ালে, ওই মৃদুমর্মরায়িত বেলগাছের তলায়, ওই ভাঙ্গা আলসের পাশে প্রাচীন ইমারতের ভগ্ন শ্যাওলাধরা গন্ধে! কত বিষণ্ণ জ্যোৎস্নায় কত নিবিড় তৃপ্তিতে আমাদের চোখে নেমে আসতো ছায়াময় নিদ্রা।

কবে যেন বাড়ীর বায়না হয়ে গেছে। এবাড়ী কিনবে

গোপালবাবু—সেই টাকার কুমীর! রেজেষ্টারী আপিসে তদন্ত চলছে, দলিলগুলি ঘাঁটাঘাঁটি করছে সবাই। কবে স্ত্রীধনে কেনা হয়েছিল, স্ত্রীধন এলো কোত্থেকে, উইল কোনো আছে কিনা, দানপত্র করা আছে কিনা, দেবোত্তর কিনা, আর কোথাও বাঁধা বিক্রি আছে কিনা—অর্থাৎ সমস্ত ইতিহাস ওল্‌টানো হচ্ছে।

মামা চীৎকার করছেন, স্ত্রীধনে খরিদ নয়, ওটা জাল-উইল, এবাড়ী হয়েছিল ফল্লা ভট্‌চার্যির টাকায়...আমি হাইকোর্ট করবো, ঘুঘুর ফাঁদ দেখাবো।

তারপর সন্ধ্যাবেলা মামা অহিফেন সেবন ক'রে এসে দিদিমার কাছাকাছি ব'সে বলেন, আমাকে এখুনি পাঁচশো টাকা ধার দাও—

দিদিমা বলে, পাঁচশো টাকা ধার দেবো? কেন বল্‌ দিকি?

আমি হাইকোর্টে নালিশ করবো।

কা'র নামে?

মামা বলেন, তোমার নামে।

দিদিমা হেসে বলেন, যা তাই করগে যা। ধারেই মকোদ্দমা চালাগে যা,—সম্পত্তি ফিরে পেলে তাদের দেনা শোধ করিস।

মামা কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন। তারপর বলেন, হুঁ...আচ্ছা, বাড়ী বেচে আমাকে কি দেবে শুনি?

তোকে ?—দিদিমা হাঁক দিয়ে ওঠেন, তোর জন্যেই আমার এই সর্বনাশ। তোকে আমি পথের ‘বেগার’ ক’রে যাবো, তবেই আমি গঙ্গামণি দেবীর মেয়ে !

মামা রাগ ক’রে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, হুঁ আফিং খেয়ে সুবিধে হবে না,—কাল আমি গাঁজা খেয়ে বাড়ী ঢুকবো ! দেখে নেবো সবাইকে।

কিন্তু আফিং, গাঁজা, চরস—কোনোটাতেই দিদিমাকে সুবিধা করা যায় না। অবশেষে মামা একদিন মরীয়া হয়ে বলেন, পুলিশে খবর দিয়েছি, তারা এসে বাড়ী শিলমোহর ক’রে যাবে···খবরদার !

পুলিশ কোনোদিনই আসে না। দিদিমা দিব্য খোষ-মেজাজে থাকেন। তবে তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ ; এ বাড়ী বিক্রি ক’রে কাশী যাওয়া ছাড়া তাঁর আর গতি নেই। চিরজীবনের মতো তিনি কলকাতা থেকে বিদায় নেবেন। বাকি জীবনটা তাঁর, বিশ্বনাথের চরণেই সমর্পিত হবে। রাত্রের দিকে দিদিমার চোখে নিঃশব্দে জল গড়াতে থাকে। মামা এবার চুপ ক’রে গেছেন ; হাইকোর্টের কথা আর শোনা যায় না।

বাড়ী বিক্রীর ঠিক তারিখটি দিদিমা গোপন ক’রে রেখেছেন। পাছে মামা একটা অশান্তি বাধান, পাছে বাইরের দিক থেকে কোনো বিঘ্ন ঘটে—এই কারণে রেজেষ্টারী ক’রে টাকা নেবার ঠিক তারিখটি চেপে রাখা হয়েছে। বাড়ীতে

মাত্র তিনটি লোক সেকথা জানে। ইতিমধ্যে খুঁজে খুঁজে মাণিকতলার ওদিকে ছোট বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে, আগামী অমুক দিনে আমাদের এই বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। আমরা চিরদিনের মতো এ বাড়ীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ঘুচিয়ে চ'লে যাবো।

কোথায় ব্যথার টান পড়েছে বুঝতে পারিনে। এ বাড়ীর ভগ্ন ইমারতের পাঁজরে, কিংবা আমাদেরই বুকের কোণে—কোথায়? এ বাড়ীর শিরাউপশিরার সঙ্গে বত্রিশ নাড়ির বাঁধন পাকে পাকে গেরো বাঁধা,—ছেড়ে যাবার কল্পনায় নাড়িতে নাড়িতে মুচড়িয়ে ওঠে। তবু চ'লে যেতে হবে,—তাড়না এসেছে, কাল পূর্ণ হয়েছে। আর আমাদের কোনো অধিকার নেই। দুর্জয় নতুন আসছে, ভাঙবে সব তাড়াবে সবাইকে, জরা ও প্রাচীনকে মৃত্যুর পথ দেখিয়ে দেবে।

যাবার আগের দিন কী ব্যাকুলতা আমাদের! ওই মিত্তিরদের বাগানের নারিকেল গাছ,—ওর পাতার চিরদিন চাঁদের আলো পিছলিয়ে পড়ে, ওই নিমগাছের পাশে শিবের মন্দিরের চত্বর, ওখানে নিত্যদিন একটা বিড়াল কাঁদে; এধারে লালার দোকান, ওধারে অর্জুনের মুদিখানা; গলির উপর গঙ্গার মা'র ঘর, আস্তাবল, ললিতবাবুর বাড়ী, দীনুগুণ্ডার আড্ডা—এরা সবাই রইলো, আমরা কাল ভোরে চ'লে যাবো। কিন্তু

যত দূর যাই

কোন চিহ্নই কি রেখে যাওয়া, যাবে না? যা'রা চ'লে যায়, তাদের সব চিহ্নই কি নিঃশেষে মুছে যায়?

আগের দিন আমরা সব জাগায় একবার ক'রে ব'সে নিলুম, একবার ক'রে সেখানকার মেঝেতে গাল পেতে শুয়ে নিলুম। সুশীতল বারান্দা, কোমল বেলতলার ছাদ, নধর নরম ঘরের মেঝে পরম প্রিয় একান্ত কুলুঙ্গি,—সব আমাদের বড় আপন। দেওয়ালের গায়ে বুক পেতে মুখ-রেখে শুনতে পাওয়া যায় কত কালের যুগযুগান্তের কাহিনী······ভগ্ন জীর্ণ ইমারতের ভিতর থেকে অযুত নিযুতযুগের কী নিবিড় আত্মীয়তা কথা ক'য়ে ওঠে, আমাদের গলার কাছে কান্না উঠে আসে। স্বচ্ছন্দ চলাফেরায় আজ আর কোন ভয় আমাদের নেই। সিঁড়ির তলায়, চৌবাচ্ছার অন্ধকার পড়ায়, স্যাওলাধরা কানাচে, নির্জন নীচের তলায় ওদিকের শূন্য পুরীর নিরালয়, কোনো, আতঙ্ক আর আমাদের ইসারায় ডাকে না। সব ভয় আমাদের ঘুচে গেল!

কাঠকয়লা দিয়ে দেওয়ালে কেউ নাম লিখে যাচ্ছে, কেউ ছুরি দিয়ে দরজার চৌকাঠে খোদাই ক'রে যাচ্ছে; কেউ পেরেক পুঁতে রাখছে, কেউ বা ভাঙ্গা ইঁটের ফাঁকে পাথরের নুড়ি চিহ্নিত রেখে যাচ্ছে,—একটু চিহ্ন, একটু নাম, একটু মলিন স্মৃতিকণা! কিন্তু আর কি কোনো স্থায়ী কৌশল নেই— যেটা যুগযুগান্তকাল ধরে প্রেমের একটা নিশানা রেখে চ'লে

যায়—? কিছু কি নিত্যকাল ধ'রে রেখে যাবার উপায় নেই? আমাদের ভালোবাসার কোনো দাগ কি কোথাও থাকবে না? আমরা সবাই দীর্ঘরাত্রি জেগে এ-বাড়ীর সর্বত্র কিছু একটা চিহ্ন রেখে যাবার চেষ্টায় অশ্রান্তভাবে কৌশল উদ্‌ভাবন করতে লাগলুম। একথা সেদিন ভাবিনি, একটা সৌরবিশ্বব্যাপী পরম অচেনার মধ্যে আমাদের চারিদিকের সকল অস্তিত্বের চিহ্ন নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যাবে?

পরদিন প্রভাতের কুয়াশার ভিতর দিয়ে আমরা বাড়ীটি ছেড়ে চ'লে গেলুম। একটা আবছায়া অস্পষ্টতা ছিল আমাদের মনে, রাতজাগা সকালের একটি জড়তা ছিল। আমরা আচ্ছন্নের মতো চ'লে গেলুম পথ দিয়ে।

* * * *

তারপর থেকে কলকাতার কত পরিবর্তন ঘটেছে; কত বস্তি ভেঙ্গে কত রাজপথ তৈরী হয়েছে।

অনেক বছর পরে একদা গিয়েছিলুম আমাদের সেই পরিচিত পল্লীতে। কিছু চেনা যায় না,—কোথায় যেন সব হারিয়ে গেছে। গঙ্গার মা'র ঘর যেখানে ছিল সেখান দিয়ে নতুন রাজপথ ছুটে চলেছে। লালার দোকানের বস্তির ওপর দিয়ে এখন মোটরগাড়ী আনোগোনা করে। আর আমাদের সেই পুরনো বাড়ীর ভগ্ন ইমারত? তা'র চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল না! সেখানে উঠেছে মস্ত পাঁচতলা প্রাসাদ,—

সেখানে এখন ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলে, সেখানে নতুন জন-কলরব,—সেখানে নব্যকালের প্রাণবন্যা। সেই বাড়ী আমাদের কোথাও নেই! নব্যকালের রথঘর্ঘরের নীচে সেই প্রাচীনের ধূলিকণাও নেই!

নেই,—তবু আছে! আমাদের বাড়ী জরাজীর্ণ ভগ্ন ইমারতের থেকে একপ্রকার শ্যাওলাধরা পুরনো ইটকাঠের গন্ধ আমার অত্যন্ত পরিচিত ছিল। সিঁড়ির তলায়, ভাঙ্গা পাঁচিলে, ইঁটের ফাটলে, নোনাধরা দেওয়ালে, অন্ধকার কলতলায়,—সেই গন্ধটা চিরদিন আমাকে পেয়ে বসতো। এখনো, এতকাল পরেও যদি কোন ভগ্ন ও জরাগ্রস্ত বাড়ীতে ঢুকি, যদি শ্যাওলাধরা অশ্বত্থশিকড়ের কাছে বসি, যদি কোনো প্রাচীর মন্দিরের চত্বরে এসে দাঁড়াই সেই গন্ধটা পাই! সেই আমাদের পুরনো বাড়ীটির গন্ধ,—তার শিরা উপশিরার সঙ্গে আমার অন্ত্রতন্ত্রের নিবিড় টান আজো অচ্ছেদ্য।

দিদিমার কথা ভাবলেই আমার মনে পড়ে বনস্পতির কথা। কত সহস্র পাখী বাসা বাঁধে ডালে ডালে, কত ঝড় সহ্য করে, কত ছায়া বিস্তার ক'রে থাকে, কত প্রাণীকে আশ্রয় দিয়ে কত দুর্যোগ থেকে বাঁচায়। সেই মতো দিদিমা দুই হাতে ধারণ ক'রে থাকতেন প্রকাণ্ড এক সংসার এবং তা'র চেয়েও প্রকাণ্ড সম্পত্তির মালিক তিনি ছিলেন। সেকালের কলকাতার অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে ছিলেন তিনি। এখন সেটাকে আমরা বলি নতুন বাজার, ওই জায়গাটার আদি মালিক ছিলেন দিদিমার পিতৃপুরুষ। আমার দিদিমার নজর ছিল উঁচু, মাথা ছিল তা'র চেয়েও উঁচু। তিনি ছিলেন একেবারেই নিরক্ষর এবং টিপসই ছাড়া আর কোনোপ্রকার সই তাঁকে করতে দেখিনি। তবু আমি হিসেব ক'রে দেখতুম, প্রায় শ'খানেক ইংরেজী শব্দ, শ' দুই ফারসী, হাজার খানেক বাংলা শ্লোক ইত্যাদি তাঁর মুখস্থ ছিল, এবং এটর্ণী, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, মাস্টার, ওভারসিয়ার, বেলিফ প্রভৃতির কাছে তিনি সেগুলো অনর্গল সুষ্ঠু প্রয়োগে ব'লে যেতে পারতেন, এবং শ্রোতারা সশ্রদ্ধ নতমস্তকে দিদিমার পরামর্শ ও উপদেশ শুনে সেই মতো কাজ করতেন। কার্তিক স্যাক্‌রা, দীনু ধোপা, দীপু গুণ্ডা, ভর্তু মিতুয়া, ক্ষীরি নাপতিনী এবং ফুলচাঁদ, গন্নুয়া, রামবিরিজ, বরদা, মতি ইত্যাদি বাড়ীর ও পাড়ার ঝি-চাকরের

দল দিদিমার কথাকে গুরুবাক্য ব'লে মনে করতো। পাড়ার অভিজাত মহলে দিদিমা পরিচিত ছিলেন সেজখুড়ি নামে। যে-সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিরা পাড়ায় সমাজপতি ব'লে ছিলেন, দিদিমাকে পথে কোথাও দেখলেই তাঁরা পথের উপরেই নত হ'য়ে দিদিমার পায়ের ধূলো নিতেন। আমার বেশ মনে পড়ে দিদিমার সুপারিশে কয়েকটি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ছেলে কলকাতা হাইকোর্টে, কুক-কোম্পানীর আপিসে এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকৃরি পেয়েছিল। দিদিমাকে কেউ নেমন্তন্ন করতো না, বলতো,—দয়া ক'রে পায়ের ধূলো দেবেন, আমরা ধন্য হবো।

দিদিমা গঙ্গাস্নান সেরে বাজার-হাট নিয়ে বাড়ী ফিরতেন বেলা একটা। আমি তাঁকে পাখার হাওয়া দিতুম, দরদর ক'রে তাঁর গাল বেয়ে ঘাম পড়তো। তিনি পোস্তার হাটে আলু আর আম কিনতে যেতেন, বৌবাজারে যেতেন কাপড় কিনতে, জোড়াসাঁকোয় যেতেন বাসন কিনতে,—কলকাতাটা ছিল তাঁর মুঠোর মধ্যে। ইট, কাঠ, লোহা, চূণ সুরকি, জলের পাইপ, মগরা হাটের বালি—এ সমস্তই তাঁর নিজের হাতের কেনা। বাড়ীর দলিল, কেনা-বেচার সর্ত, হ্যাণ্ডনোট, হাতচিঠে, বন্ধকী কোবালা, হক্-হকুক-মৌরসী-হক্দারী-জমিদারি, খাস-বিলি—অর্থাৎ যত রকমের জমি জায়গা সংক্রান্ত ব্যাপার,—দিদিমার ছিল নখদর্পণে। দিদিমার সর্বপ্রকার ব্যাপারে আমি

থাকতুম পাছে পাছে। নারী স্বাধীনতার আশ্চর্য উদাহরণ দেখেছি দিদিমার জীবনে।

বাড়ীতে কখনও চোর পড়ে নি দিদিমার ভয়ে, বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ উঁচু গলায় কখনও কথা ক'য়ে যায় নি। মামাকে একবার দিদিমা বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দিয়েছিলেন, সাত মাস মামাকে বাড়ী ঢুকতে দেন নি। মামা নাকি পাড়ার কোন মাননীয় ব্যক্তিকে অপমান করেছিলেন। দ্বাদশী ছাড়া বেলা দুটোর আগে দিদিমাকে কখনও জলগ্রহণ করতে দেখি নি। তেতলায় তাঁর পূজার ঘর ছিল, সেখানে ছিল বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ। পূজা সেরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামতেন, আর আমি তাঁর শশা কলা আর চিনির রেকাবটার দিকে লক্ষ্য রাখতুম।

ছোটবেলায় আমার উপার্জনের জায়গাটা ছিল দিদিমার কোষাগারে। তাঁর কালো বাক্সয় তামার পয়সা থাকতো অনেক, সেগুলো গুণে গেঁথে রাখার ভার ছিল আমার উপর,—অর্থাৎ আমি সেই তাম্রখণ্ডগুলোতে নিয়মিত গোপনে ভাগ বসাতুম। দিদিমার পাকা চুল তুলে দেওয়া, তাঁর বেতো পায়ে তারপিন্ তেল মালিশ করা, তাঁর চোখের অসুখের জন্য পদ্মমধু ঢেলে দেওয়া, তাঁর সিন্ধুক খুলে মকরধ্বজের কৌটা বা'র করা, তাঁর গামছা-কাপড় খুঁজে আনা,—ইত্যাদি, এইসব আমার উপার্জনের পন্থা ছিল। দিদিমার সঙ্গে অপরাহ্ণের

দিকে পাড়ায় বেড়াতে বেরুলে আমার ভাগ্যে নানাবিধ বক্‌শিস জুটে যেতো।

মা আমাকে পান খেতে দিত না। অমনি দিদিমার গা ঘেঁসে ব'সে এদিক ওদিক চেয়ে বলতুম, আমার গা বমি-বমি করছে, দিদিমা!

দিদিমা তৎক্ষণাৎ ভয়ে চঞ্চল হ'য়ে হন্তদন্তভাবে বলতেন, ওমা, সে কি বাছা, বমি-বমি কেন? এখন যে দিনকাল খারাপ!

বলতুম, বড্ড গা কেমন করছে, দিদিমা—

দাঁড়া তবে; বাক্সটা খুলে একটু কর্পূর বা'র করি—দিদিমা উঠে দাঁড়াতেন।

আমি বলতুম, না দিদিমা,: একটা পান খেলে এক্ষুণি সেরে যায়!

দিদিমা বলতেন, ওমা, তাইত,—ওই যে ডাবরে পান সাজা আছে, আমিই এনে দিচ্ছি, দাঁড়া—

পান মুখে দেওয়া মাত্র আমার বমি সেরে যায়।—

একসময় বলতুম, আচ্ছা দিদিমা, আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ে কেন?

নাক দিয়ে রক্ত।—বলিস কিরে? তোর মাকে বলেছিস? —দিদিমা কপাল চাপড়ে উঠতেন।

আমি বলতুম, আমার অসুখ, ওরা কেউ বিশ্বাস করে না।

দিদিমা বলতেন, দইয়ের ঘোল, মিছরির পানা—এসব না খেলে তো সারবে না? যা যা, শিগগির দই আন বাছা—দিদিমার কাছ থেকে এক ঝোঁকে চার পয়সা আদায় ক'রে নিতুম।

তাঁর ঠাকুরঘরে পাড়ার লোকে পূজার উপচার ও প্রণামী পয়সা দিয়ে যেতো,—আমার বাঁকা নজর থাকতো সেই পয়সাগুলোর দিকে। আমার সুবিধা ছিল, বাণেশ্বর শিব কথা বলে না, এবং সেটা মুখাকৃতিও নয়। সুতরাং ঠাকুর-ঘর সম্বন্ধে আমার সংস্কারমুক্ত মন ছিল। আমি দেখতুম, ঠাকুরের কাছে যে যা নৈবেদ্য উপচার এবং খাদ্য-সামগ্রী দেয়—সেগুলি পূজার পরেও অক্ষুণ্ণ থাকে; সুতরাং বুঝতে পারা যায়, ঠাকুর কিছুই ছোঁয় না। এটি আমার পক্ষে ভারি সুযোগ ছিল। মহাষ্টমীর রাত্রে সন্ধি পূজার ক্ষণে অথবা কালীপূজার রাত্রে দেবীরা নাকি জাগ্রতা হ'য়ে পূজা উপচারের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করেন, কিন্তু জিনিষপত্রগুলো অটুটই থাকে। আমি খুব খুশী হতুম।

একবার আমার পায়ে কাঁচ ফুটে খুব কেটে গেল, রক্ত পড়ছে ঝর-ঝর ক'রে। দিদিমা ছুটলেন আয়াপানি পাতা আনতে। পাতা এনে আমার পায়ে লাগানো হোলো। আমি কেঁদে বললুম, দিদিমা, চটি জুতো না হলে রোজ রোজ আমার পা কেটে যাবে। আমি আর বাঁচবো না।

কিন্তু চটি জুতো পায়ে দেওয়া মায়ের হুকুম ছিল না। তা' বললে কি হয়, দিদিমা পরের দিন গঙ্গাস্নানের ফেরৎ গরাণহাটার মোড় থেকে আমার পায়ের মাপে চটি জুতো কিনে আনলেন। মা গম্ভীর আড়চোখে ব্যাপারটা দেখে গেল। অর্থাৎ শাসনটা তখনকার মতো তোলা রইলো।

আমি বললুম, আচ্ছা দিদিমা, আপনি যে বলেন, ভয়ে ভয়ে থাকলে মানুষের অসুখ করে, একি সত্য ?

দিদিমা জবান দেন, সত্যি বৈকি বাছা !

বললুম, তা'হলে মায়ের ভয়ে ভয়ে থেকেই ত আমার এই পেটের অসুখ !

দিদিমা হাসিমুখে বলেন, তুমি চুরি ক'রে খাওয়া ছেড়ে দাও বাপি,—তা'হলেই তোমার সব অসুখ সেরে যাবে।

আমি বিমর্ষভাবে চুপ ক'রে যেতুম। তাঁকে বোঝাবো কেমন ক'রে যে, অভ্যাসটা বদলানো যায় না।

ইন্দু নামক একটি বালককে দিদিমা দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না—কারণ তা'র বাবা নাকি লোককে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিত। একবার পূজার সময় বললুম, দিদিমা, ইন্দু কি বলে জানেন ?

দিদিমা ভুরু কুচকে আমার দিকে তাকালেন। বললুম, ইন্দু বলে কি, তোর দিদিমা পাবে কোথা যে, তোকে ফুলকাটা সাটিনের জামা দেবে ?

দিদিমা রাগে ফুলে উঠলেন। একটি মহামূল্যবান জামা সেবার পূজায় পাওয়া গেল!

একবার একটা লোহার খাঁচায় আমার চোখের কোণটা কেটে খুব রক্তপাত হোলো। রক্তটা থামাতে অনেকটা বেগ পেতে হয়েছিল। বিছানায় শুয়ে চুপ ক'রে প'ড়ে আছি, আর আমার চারদিক ঘিরে সবাই বসেছে। ভাবলুম সবাই যখন চিন্তিত, তখন আমার আঘাতটা নিশ্চয়ই ঘোরালো। এর সুযোগ না নিলে আমার কিছুতেই চলবে না। আমি চোখ উল্‌টে প'ড়ে রইলুম নিস্তেজ হবার ভাণ ক'রে, সকলে ভাবলো প্রচুর রক্তপাতের ফলে আমি হয়ত জ্ঞান হারাবো। কিন্তু জ্ঞান হারাবার ভাণ করতে গিয়ে যদি ধরা পড়ি,—কারণ, আমার ছোট বোন আমার চাতুরী বেশ বুঝতো,—তা'হলে সে বড় কেলেঙ্কারী! সুতরাং ওই এক রকম ক'রে প'ড়ে রইলুম। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে চোখ খুলে দেখলুম, দিদিমা ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই। ক্ষীণকণ্ঠে আমি ডাকলুম, দিদিমা?

তখন রাত অনেক। দিদিমার বোধ হয় তন্দ্রা এসেছিল। চমকে উঠে তিনি বললেন, কেন বাপি, জল দেবো একটু?

না।—

কিছুক্ষণ পরে আবার ডাকলুম, আচ্ছা দিদিমা—?

দিদিমা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ভয় কি, ভয় কি বাপি, এই ত আমি?

আমি আমার কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব ভগ্ন ও গভীর ক'রে তুললুম। অতি মৃদুস্বরে বললুম, লোকে ম'রে গেলে কোথায় যায় দিদিমা?

দিদিমা হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন। বললেন, ষাট, ষাট, ষেটের বাছা আমার, একশো বছর পেরমাই হোক তোর,—আমি যেন যাই সকলকে রেখে!—ওমা আজ যে শনিবার, আমাবস্যে,—এই ব'লে ধড়-মড় ক'রে উঠে তিনি বাক্স খুলে সোয়া পাঁচ আনা পয়সা এনে আমার বালিশের নীচে রাখলেন। বললেন, এই সামনের মঙ্গলবারেই কালীঘাটে পূজো দিয়ে আসবো। আহা, বাছারে আমার!

বলা বাহুল্য, ওই সোয়া পাঁচ আনা মঙ্গলবারে আর দিদিমা আমার বালিশের তলা থেকে খুঁজে পান নি। পয়সার প্রতি আমার কোন লোভ ছিল না, এই তিনি জানতেন। আমি তাঁর কাছে নিজেকে অতি নির্বোধ ও অর্বাচীন ব'লে প্রতিপন্ন করতুম। তীক্ষ্ণবুদ্ধি অথবা চতুর কথাবার্তা দিদিমা পছন্দ করতেন না।

বাড়ীটা ছিল পুরনো, দেওয়ালগুলো অনেকস্থলে বালি-ধ্বসা, ইটের ফাঁকগুলি হা ক'রে থাকতো। একদিন ঘরের মধ্যে রেড়ির তেলের আলো জ্বলছে। আমি দেয়ালে ঠেস

দিয়ে ব'সে আছি, দিদিমারা জলযোগ করছেন রাত্রে। সহসা পিঠের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আমি চীৎকার ক'রে উঠলুম—সাপ।

লাফ দিয়ে পড়লুম দূরে। সকলে হাউ মাউ ক'রে উঠলো। দিদিমা চেঁচিয়ে উঠলেন, তোকে কামড়ায়নি ত?

বললুম, কি জানি, পিঠের কাছে যেন ছুঁচ ফুটলো।

তবেই হয়েছে! ওমা কি করবো, কোথা যাবো?—সকলে হাক পাক করতে লাগলো। আমি ততক্ষণে এক খুন্তি হাতে নিয়ে সাপটাকে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরেছি। খুন্তির ধারালো পাতটাতেই সাপের মৃত্যু ঘটলো।

কিন্তু সাপের বিষ যে আমার সর্বশরীরে ততক্ষণ সঞ্চারিত হচ্ছে—তা'র উপায়? আমাকে শোয়ানো হোলো মেঝের উপর মাত্নর পেতে। রেড়ির তেলের আলোয় শুয়ে আমি কড়ি-কাঠের কাছে নীল আর সবুজ বর্ণ দেখতে লাগলুম,—অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা, পিঠের ঠিক কোনখানে সাপটা ছোবল বসিয়েছে। তবে কিনা ওরা জাত সাপ, ওদের ছোয়াতেও বিষ। বাড়ীময় একটা হৈ চৈ প'ড়ে গেল। মামীমা মুখ বাড়িয়ে বললেন, আহা ছেলেটা সারাদিন বাড়ীখানাকে মাতিয়ে রাখতো,—কাল থেকে খাঁ খাঁ করবে।

মামা বললেন, তোমরা যদি বলো আমি ওকে খানিকটা আফিং খাইয়ে দিই, বিষে বিষক্ষয় হবে। সেই যে সেবারে

আমাকে কামড়ে একটা মস্ত বড় গোখরো সাপ নিজেই ম'রে গেল, আমার কিছুই হোলোনা,—মনে নেই?—এঃ এ যে চন্দ্রবোড়ার বাচ্ছা রে, এর বিষ?—এই ব'লে আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আমাকে মামা: পুনরায় ব'লে গেলেন, শিবের অসাধ্য!

আমি আর্তনাদ ক'রে উঠলুম, দিদিমা, কি জ্বালা করছে, আমি···আমি তেঁতুল-গোলা খাবো।

মা একটু সন্দেহ করেছিলেন। এবার বললেন, আজ সারাদিন তেঁতুল-গোলা খাবার জন্যে বাহানা নিয়েছিল, আমি দিই নি!

আশ মিটিয়ে এবার আমি তেঁতুল-গোলা খেলুম। তার পর আস্তে আস্তে বললুম, দিদিমা চোখে ঝাপসা দেখছি কেন?

দিদিমা কেঁদে উঠলেন, এই যে বাবা, এই যে আমি! তুমি ভালো হ'য়ে ওঠো, তোমাকে শান্তিপুরের ধুতি কিনে দেবো!

ক্লান্তস্বরে বললুম, দিদিমা, আমার এত ক্ষিধে পায় ইস্কুলে গিয়ে।

আচ্ছা, আচ্ছা, আমি রোজ দু'পয়সা ক'রে দেবো। এক পয়সা আলুরদম-কচুরি, আর এক পয়সা আলু-কাবলি কিনে খেয়ো, কেমন?

দিদিমার প্রস্তাবে ওধার থেকে ছোট বোন আঁৎকে কেঁদে উঠলো, অমন সর্বনেশে কাজ করো না দিদিমা, ও রোজ পাজামা নষ্ট ক'রে বাড়ী ঢুকবে, আমাকেই সব করতে হবে! আর আমি পারবো না।

কোথায় গেল সাপের বিষ, আর কোথায় মৃত্যুর নীল সবুজবর্ণ! আমি রাগে তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়াতেই ছোট বোন পালিয়ে গেল একপাড়া থেকে আরেক পাড়ায়। মা আমাকে দেখে বললেন, আমি তখনই জানতুম, ওর কিছু হয়নি। দিদিমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে গেলেন এবং আমার মৃত্যুর সম্প্রতি কোন সম্ভাবনা নেই দেখে মামা মুখ খিচিয়ে বললেন, আমি তখনই বলেছিলুম না,জাত বসন্তের বিষ রয়েছে ওর শরীরে, সাপের বিষ ওর করবে কি? এক-শোবার বলছি, আমার কথা শোনো—ওকে এখন থেকেই একটু একটু আফিং খেতে শেখাও, দেখবে কোনো বিষ ওর শরীরে আর ঢুকবে না।

কিন্তু চোখে ঝাপসা দেখছি এই কথাটা আমি সকলকে শুনিয়ে বেড়াতে লাগলুম। বিশেষ ক'রে দিদিমা যখন নিরি-বিলিতে বসতেন,—ছোট বোন আর ছোটদাদা যখন কাছা-কাছি থাকতো না,—সেই সময় গুটি গুটি দিদিমার কাছে এসে বলতুম, আচ্ছা দিদিমা, আপনার চোখ কি আমার চাইতেও ঝাপসা?

যত দূর যাই

দিদিমা একদিন বললেন, কি বলিস বাছা, তোর কথা বুঝতে পারিনে।

বললুম, আমি আর আকাশের ঘুড়ি দেখতে পাইনে। সেদিন একখানা মোটর-গাড়ী…ভাগ্যি ঘাড়ে এসে পড়ে নি! সব ঝাপসা দেখি। সেবার সাপে ছোঁবার পর থেকেই এমনি হয়েছে দিদিমা।

দিদিমা মাকে ডেকে বললেন, বলি, ছেলেটার সর্বনাশ করতে চাস তোরা? ওর ভবিষ্যৎ মাটি হতে বসলো যে! চোখ নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে, ঝাপসা দেখছে, ডাক্তারবাড়ী পাঠাও। পুরুষ মানুষের চোখ নষ্ট হ'লে এরপর খাবে কি ক'রে?

আমিই ডাক্তারের বাড়ী খুঁজে বের ক'রে দিদিমাকে জানালুম। দিন দিন যে আমার চোখ ক্রমশঃ ঝাপসা হ'য়ে আসছে,—এইটি সাক্ষ্য-প্রমাণসহ বলবার চেষ্টা করলুম। চশমা না নিলেই আর আমার আর চলছেনা! চশমা আমার চাই। বলা বাহুল্য, ভালো ডাক্তারের কাছে যেতে আমি রাজি নয়। কাঁসারীপাড়ার মোড়ে যে চোখের ডাক্তারটি ছিল, সে-লোকটি আমার চোখ পরীক্ষা করতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হোলো। অন্ধকারে চোখের উপর আলো ফেললো, দূরের থেকে অক্ষর পড়ালো, ওষুধ দিল। কিন্তু চশমা ছাড়া চোখের অসুখ সারবে কেমন ক'রে? দিদিমা বললেন, চশমার জন্যে যত টাকা লাগে আমি দেবো।

যত দূর যাই

একদিন প্রায় পনেরো টাকা খরচ ক'রে ভাল নিকেল ফ্রেম্ আঁটা চশমা চোখে দিয়ে হাসিমুখে বাড়ী ঢুকলুম। আর আমার কোনো অসুখ নেই! আজ সেকালের সেই দিদিমা বেঁচে থাকলে বলতে পারতুম, আমার দৃষ্টি কোনোকালেই ঝাপসা হয় নি! দিদিমা, আজো তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাই!

এ কথা জানতুম—কুকুররা প্রভুভক্ত জীব। প্রভুর জন্য তা'রা জীবন বিপন্ন করে। কিন্তু প্রভু যারা নয়, যারা অপরিচিত —তাদের দেখলে ঘেউ-ঘেউ ক'রে কামড়াতে আসে—এই কারণে দিদিমার মতন আমিও কোনোকালে কুকুর পছন্দ করি নি। শুনতে পাই কুকুর নাকি বহু বিচিত্র জাতের—ফর্দ করলে নাকি সংখ্যায় কুলোয় না। কিন্তু আমার ধারণা, কুকুরের একটিমাত্র জাত আছে, এবং সেটি হোলো এই যে, সে কুকুর। কুকুরের ওপর আভিজাত্য চাপিয়ে এক শ্রেণীর লোক অভিজাত বনতে চায়, কিন্তু কুকুরের নিজস্ব কোনো জাত নেই,—কুকুর কুকুরই থাকে। দিদিমা বলতেন, ওদের জলি কুকুরই বলো আর তোমাদের ভুলো কুকুরই বলো—আঁস্তাকুড় শোঁকে দু'জনেই। অমন নির্ঘিন্নে জাত আর দুনিয়ায় নেই, বাছা।

আমার সঙ্গে কুকুরের চিরদিনের আড়ি। কুকুর দেখলেই আমি

চিনতে পারি, এ জানোয়ারটি সোজা নয়, এবং কুকুর আমাকে দেখলেই বুঝতে পারে, এ ব্যক্তি সহজ নয়। পরবর্তীকালে নিরস্ত্র অবস্থায় আমি বাঘের জঙ্গলে ঢুকেছি অবলীলাক্রমে, কিন্তু কোন বাড়ীতে রোখা কুকুর আছে, এ কথা শুনলে সে পাড়ায় আমি ঢুকিনে। হাতীবাগানে পুঁটের রাজবাড়ীতে দুটো বড় বড় কুকুর ছিল, ওর মধ্যে একটা আমার পায়ে একবার কামড়ে দিল। সেই বিষ নষ্ট করার জন্য মাসিমা দিয়েছিলেন আমার পায়ে পোড়া খুন্তির ছ্যাঁকা,—আমার পায়ে ঘা ছিল একমাস। দিদিমা কত ওষুধ-পত্র দিয়ে সেই ঘা ভালো করেছিলেন।

একবার একটি কুকুর-বাচ্চা আনলুম বাড়ীতে।

যতদূর মনে পড়ছে সেই বাচ্চাটা শীতের রাত্রে কাঁদতো পথের ধারে। তা'কে এনে ঘরে ঠাঁই দিলুম। কী যত্ন তা'র স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য! কাঠের বাক্সের মধ্যে তা'র বিছানা, দিদিমার ছেঁড়া কম্বলের টুকরো তা'র গায়ে, আমার দইয়ের ভাগ দিতুম তা'কে, তা'কে স্নান করাতুম হলুদ জলে, মাংস খাওয়াতুম ঘন ঘন। তা'র জন্য চকচকে চেন্, নতুন বক্‌লস্, তা'র পায়ে বাঁধা ঘুঙর। শীতের সকালে তা'কে কাঁচা রোদে বসিয়ে আমি চুপটি ক'রে ব'সে থাকতুম তা'র পাশে। তা'র চেয়ে আমি তা'র বেশী ভক্ত ছিলুম। দিদিমা মাকে ডেকে বলতেন, বাইরে গিয়ে দৌরাত্মি ক'রে বেড়ানোর চেয়ে কুকুর নিয়ে ভুলে থাকে ত থাক্।

যত দূর যাই

সকালে কুকুর নিয়ে বেড়াতে যেতুম হেদোর ধারে। চেন্-বাঁধা কুকুর নিয়ে যেতুম ইন্দুদের বাড়ী। যাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধতো, তাদের ওপর কুকুরটাকে লেলিয়ে দিতুম। বন্ধুদের কাছে আমি হ'য়ে উঠলুম আতঙ্কের মতো।

অতি যত্ন আর টানা হেঁচড়ার চোটে কুকুরটা ক্লান্ত বোধ করছিল, এটা বুঝতে পারি নি। সে আজকাল আমাকে দেখলেই ঘেউ-ঘেউ ক'রে ডাকে, এবং ছড়ি ঘুরিয়ে মারতে গেলেই ল্যাজ গুটিয়ে বাসায় গিয়ে ঢোকে। অর্থাৎ ভয় করে, ভালোবাসে না। আমারও অক্লান্ত চেষ্টা, তা'র কাছে শ্রদ্ধা ভক্তি আদায় ক'রে নেবো। কিন্তু আমি কাছে যাই, এটা সে পছন্দ করে না, কাছে গেলেই গোঁ গোঁ করতে থাকে। একদিন উত্তেজিতভাবে শাসন করতে গিয়ে হঠাৎ কুকুরটা আমার পায়ে কামড়ে দিল,—দিদিমা কাঁপতে কাঁপতে নিয়ে গেলেন টোটকার দোকানে। একটি ছোট শিকড় একখানা মেটে সরায় রেখে দোকানি আমায় বললে, সরায় ডান পা রেখে ঘোর। সরা যদি ভাঙ্গে তবে বিষ নামলো, যদি না ভাঙ্গে তবে শিবের অসাধ্য।

দিদিমা দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন পথের ধারে দাঁড়িয়ে। তাঁর দুই চোখে জলধারা। এবারে আর আমি কিছুতেই বাঁচবো না, এই তাঁর ধারণা।

আমার ইচ্ছে, আমাকে বাঁচাবার জন্য চতুর্দিকে একটা

তোলপাড় হোক, আমি ব্যক্তিপ্রাধান্য লাভ করি, মরবার আগে একটা খ্যাতিলাভ ক'রে যাই। সুতরাং সরাখানা যাতে না ভাঙ্গে তা'র জন্য অতি মৃদুভাবে তা'র ওপর পা রেখে ঘোরবার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, খ্যাতি আমার কপালে লেখা নেই,—অতএব মুট ক'রে সরাখানি ভেঙ্গে গেল। অমনি আমি মুসড়ে পড়লুম। দিদিমাকে বোঝালুম, ওখানা কাঁচামাটির সরা, ওখানা ত ভাঙ্গবেই। আমার শরীরটা যেন কেমন করছে, দিদিমা !

দিদিমা আর্তকণ্ঠে বললেন, কি করছে বাপি ?

কুকুরে কামড়ালে বিষক্রিয়া কেমন তা' জানিনে। সুতরাং আলগোছে বললুম, চোখ দুটো যেন ঘোলাটে হ'য়ে আসছে ······আমার মাথাটা···

দিদিমা নারায়ণ মধুসূদন করতে করতে সেইদিনই আমাকে নিয়ে গোঁদলপাড়ায় ছুটলেন। এইটিই আমি মনে মনে কামনা করেছিলুম।

যতদূর মনে পড়ছে শ্যামনগর অথবা কাকনাড়ায় নেমে গঙ্গার ঘাট পেয়েছিলুম। আসলে আমার চোখ ছিল ওই ভ্রমণটার দিকে। ওখানে আছে নৌকা, ঢেউয়ে সেটা টলমল করে, দাঁড়ের ছপ-ছপ শব্দ হয়, কান পেতে থাকলে জাহ্নবীর জপের মন্ত্র শোনা যায়। আমার ইচ্ছে, গঙ্গার জলধারায় কোথাও একটা বিপদ ঘনিয়ে উঠুক, নৌকার উপরে

লাগুক জলবাসী কোনো অতিকায় জানোয়ারের ল্যাজের একটা ঝাপট, কিম্বা হালখানা ভাঙ্গুক, পাল ছিঁড়ে যাক, নৌকায় জল উঠুক—অর্থাৎ বিপদ একটা কিছু ঘটুক। আর নয় ত সেজমাসিমার বর্ণনার মতো কালবৈশাখী ঘনিয়ে আসুক, মেঘ আসুক ছুটে গঙ্গায়, বজ্রপাত হোক, বিদ্যুতে চোখে ধাঁধা লাগুক,—আর দিদিমা ত্রাহি মধুসূদন ব'লে চীৎকার করুন। পদ্মায় ভাঙন ধরে, দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গে, মেঘনায় ঘন ঘন নৌকা ডোবে.···কিন্তু আমাদের এই গঙ্গায় কোনো বিপদ নেই কেন? বিপদ কেন আসেনা যখন তখন?

ওপারে গোঁদলপাড়ার গ্রামে ঢুকে খুঁজে-খুঁজে একটি বাড়ী বা'র করা গেল। এক সধবা স্ত্রীলোক কিছু পয়সা নিয়ে বিভিন্নপ্রকার গাছ-গাছড়ার সাহায্যে কি যেন ঔষধি প্রস্তুত করলো, তারপর তা'র মাথার চুলের রাশ এলিয়ে সেই ঔষধি শিল-নোড়া নিয়ে বাটতে লাগল। দিদিমা তাঁর ইষ্টমন্ত্র জপ করছিলেন চোখের জলে, আর আমি অশেষ চাতুরীর সঙ্গে মুখের ভাবখানা এইভাবে বজায় রাখলুম যে, সংসার আমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছে বটে, তবে মৃত্যুর আগে যেন কোনো অভিমান রেখে না যাই! মুখে বললুম, দিদিমা, বড় দুঃখ রয়ে গেল, আলু-কাবলিওলার চার আনা দেনা শোধ করা হোলো না। আপনিই ত বলেন—দেনা রেখে গেলে নরকবাস হয়।

দিদিমা কাঁদতে কাঁদতে তখনই আমার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে চার আনা আমার হাতে দিলেন। অতঃপর বুড়ির কাছে আর কি-কি কৌশলে পয়সা আদায় করা যায় তা'র ফিকির খুঁজতে লাগলুম মনে মনে।

সধবাটি তা'র এলোচুলে ঔষধ প্রস্তুত ক'রে একটি কলাই-করা বাটি আমার হাতে দিয়ে বললে, ওষুধ খেয়ে এই বাটি ধুয়ে আন ওই পুকুর থেকে! কিন্তু—খবরদার! বলি, ওরে বনচাঁড়াল, দেখে শুনে যাস ত যাস ঈশাণ কোনে!

স্ত্রীলোকটি চোখ উল্‌টে দু'হাত ঘুরিয়ে কেমন যেন অঙ্গভঙ্গি ক'রে বাটিতে দু'বার ফুঁ দিল, তারপর মন্ত্র প'ড়ে বললে, শ্যামপিয়ারী রাধাকিশোর, কী গুণ জানে বাঁশী!

বাটির ঔষধটা খেয়ে আমি ধুতে গেলুম পুকুরে। সধবাটি দিদিমার কানে কানে বললে, কুকুরের বিষ যদি থাকে তবে জলে ঝাঁপ দেবে, কিম্বা জল দেখে পালিয়ে আসবে ভয়ে। না, না, আপনি যাবেন না সঙ্গে—ওকে একলাই যেতে হবে! ওরে বনচাঁড়াল, যেতে হয় যাবি ত যাস ঈশান কোণে!

পুকুরের সিঁড়িতে নেমে আমি বসলুম বেশ সমারোহের সঙ্গে। সেটা বসন্তকাল। ছলছলে স্থির কালো জল, অতি স্নিগ্ধ। দুই পারে নানা গাছে ফুল ধরেছে, মধ্যাহ্নে পাখীদের কণ্ঠে কাকলী। বাতাস ব'য়ে চলেছে বনমর্মরে। আশেপাশে প্রাচীন গ্রামের ভাঙ্গা অট্টালিকার অবশেষ,—একটি পুরাতন

ইতিহাস যেন বাতাসের সঙ্গে নিশ্বাস ফেলছে মৃদু মৃদু। ভারি ভালো লাগলো জলাশয়।

দিদিমা থাকতে পারেন নি, কাঁদতে কাঁদতে এলেন ছুটে। আমি ঘাটের শেষ সিঁড়িটায় ব'সে বললুম, দিদিমা, আমার দই খাওয়া যে হোলো না? কবে হবে?—গলাটা কাঁপিয়ে দিলুম ভাবাবেগের ছোঁয়া লাগিয়ে।

হবে বৈ কি, এখুনি হবে। যত দই খেতে পারিস, দেবো! এই নে বাছা, এখুনি একটা টাকা নে,—দিদিমা অস্থির আবেগে কাঁদতে লাগলেন।

টাকা! ষোল আনা!—আমি তখনই দু'পা জলে নেমে বেশ ক'রে বাটিটা ধুয়ে হাসিমুখে উঠে এলুম। একটি টাকা আমার হাতে দিয়ে দিদিমা আশীর্বাদ করলেন। আমার সকল বিষ কেটে গেল তখনই।

দিদিমা একদিন মরবেন, তাঁর মুখে এই কথাটা যখন শুনতুম, সংসার আমার চক্ষে শূন্য মনে হোতো। দিদিমা একদিন থাকবেন না, আমার পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাবো না! এই বনস্পতি যেদিন কাৎ হ'য়ে পড়বে, সেদিন রূঢ় বাস্তবের প্রখর আলোয় আমার ধাঁধা লাগবে, আমি হয়ত পথ হারাবো। মৃত্যুর আগে তিনি কাশী যাবেন জানাচ্ছেন, আমি ভাবছি তিনি গাড়ীতে উঠলেই আমি চাকার তলায় শুয়ে পড়বো। ভয় দেখিয়ে পয়সা নেবো আর কা'র

কাছে? প্রহারেরের ভয়ে পালিয়ে আশ্রয় নেবো আর কা'র আঁচলের তলায়? ঘুমের আগে উপকথা আর রূপকথা শোনাবে আর কে? আমার সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ অভাব অভিযোগ যক্ষীর মতো আগলাবার মানুষ আর কোথায়?

প্রচুর সম্পত্তির মালিক ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর অহঙ্কার ছিল পর্বত-প্রমাণ। তিনি বলতেন, এমন ছোট হ'য়ে জন্মাই নি যে, বিষয়-ভোগে ডুবে থাকবো। ধ'রে রাখতে সবাই পারে, ছাড়তে জানা চাই!

রামপ্রসাদের একটি গান তাঁর বড় প্রিয় ছিল,—"মা আমায় ঘুরাবি কত, চোখ-বাঁধা বলদের মত। ভবের গাছে বেঁধে ওমা, পাক দিতেছ অবিরত।" দীনু ধোপা, ক্ষিরি নাপতিনী, ভতু মিতুয়া, দীপু গুণ্ডা—এরা দিদিমার অন্নবস্ত্রে আর অর্থে প্রায়ই প্রতিপালিত হোতো। অভাবগ্রস্তদের বাড়ীতে গিয়ে তিনি চাল-ডাল ইত্যাদি 'সিধে' সাজিয়ে, তা'র সঙ্গে নতুন কাপড় দিয়ে তুলে দিয়ে আসতেন। বলতেন, ওরা এসে হাত পেতে দাঁড়ালে আমার মাথা হেঁট হয়। তার চেয়ে আগেই দিয়ে আসি।

দিদিমার ইচ্ছে ছিল, সম্পত্তি কিছু থাকতে তাঁর যেন মৃত্যু না হয়, তিনি যেন কোন মোহ, কোন ভাবনা নিয়ে না যান—সর্বহারা অবস্থায় তাঁর যেন মৃত্যু ঘটে! তাঁর তসরের অনেকগুলো থান ছিল, সেগুলো প্রতিবাসিমহলে বিতরণ

করলেন। বাড়ীর বৌ আর মেয়েরা, নাতনীরা সোনা ভালবাসে—দিদিমা তাদের সকলকে কিছু কিছু সোনা কিনে দিলেন। তাঁর সিন্দুক আর বাক্সটা যেন কে একজন নিয়ে গেল, তাঁর তামার বাসন আর নামাবলী দিলেন বিধবা মেয়েদের,—তাঁর স্থাবর আর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি পাবার জন্য শকুনির অভাব ছিল না। কাশীযাত্রার দিন আমাকে কোলে বসিয়ে আদর ক'রে এক হাঁড়ি দই আমার জন্য ব্যবস্থা ক'রে গেলেন।

দধি নাকি অমৃত—শুনতুম বাল্যকালে! কিন্তু সেই অমৃতের আস্বাদ পেয়েছিলুম, যেদিন কাশীতে দিদিমাকে দেখলুম সর্বহারা, সর্বশূন্যা! তাঁর অন্ন জোটে না, তাঁর পরণে কাপড় নেই, শোবার বিছানার অভাব, চোখ দু'টি প্রায় দৃষ্টিহীন, ঘাড় কাঁপে,—কিন্তু মুখের হাসিতে সেই প্রসাদগুণ, কণ্ঠে সেই করুণ আশীর্বাণী। আমি যে একজন হোমরাচোমরা যুবক তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি আমায় সেই বাল্যকালেই চিনে রেখেছিলেন। তাঁর শীর্ণ হাতের মুঠোয় একটি দু'আনি চেপে রেখেছিলেন, আমার চিবুক নেড়ে বললেন, এই দু'আনার দই কিনে খেয়ো, বাপি—তিনমাস ধ'রে এটি জমিয়ে রেখেছি! সমস্ত শূন্য ক'রে দেওয়া, সেই ত গৌরব! সকলের নীচে নেমে যাওয়া, সেইখানেই ত পুণ্য,—বিশ্বনাথ সেইখান

থেকেই ত তুলে নেন—দিদিমার অন্তিমকাল অবধি এই বিশ্বাসই অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর জন্য কিছু খরচ করবো, কিছু খাওয়াবো, কিছু ঋণ শোধ করবো—এ স্পর্ধা কোনদিন করিনি! সেবার ফিরে আসার সময় যখন টাঙ্গাগাড়ীতে উঠছি, সেই সময়টিতে দিদিমা দেয়াল ধ'রে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এলেন। হাতে তাঁর একখানি নতুন শালুর লেপ। চোখের জল মুছে তিনি বললেন, লেপখানি তুমি নিয়ে যাও বাপি।

আমি অবাক্, তিনি খবর রাখেন না, তাঁর নাতি এখন বেশ উপার্জনশীল। এ খবর তাঁর রাখার দরকারও নেই। বললুম, সে কি দিদিমা, লেপ আমার কি হবে?

তা' হোক বাপি, ছোটবেলায় তোর গায়ে লেপ জোটে নি সেকি ভুলতে পারি?

নিয়ে যা—নিয়ে যা বাপি, নৈলে আমার মুক্তি নেই!

বললুম, আপনি কি গায়ে দেবেন, দিদিমা? এত শীতে আপনি—?

আমি? আমার ভাবনা আজ তুই ভাববি? মণিকর্নিকায় অনেক কাঠ আছে, তাই চাপা দেবো! যা নিয়ে যা বাছা—

মাথা নত ক'রে দুই হাত পেতে লেপটি নিলুম। এই তাঁর শেষ দান, তাঁর শেষ সম্বল।

পনেরো বছর আগে শ্রাবণের শেষে মা এক চিঠি আমার

হাতে দিলেন, দিদিমা কাশী লাভ করেছেন! আমি লেখা-পড়া করছিলুম একমনে, মুখ তুলে চিঠিখানা আদ্যোপান্ত প'ড়ে বললুম—ও, তাই নাকি!

অমৃতের আস্বাদটা বোধ হয় তখনও গলার মধ্যে লেগেছিল, তাই কণ্ঠস্বরটা কেমন জড়িয়ে গেল। দিদিমা বলতেন, কাশীতে মৃত্যু হ'লে পথের ধারে পাথর হয়ে প'ড়ে থাকে। সবাই মাড়িয়ে যাবে, সেই ত কাশীলাভ!

আজো কাশী যাই, মাঝে মাঝে মনের ভুলে এক-একখানা পাথর পরীক্ষা করি!

মেয়েরা নাকি পুরুষের জীবনে দুঃখের বোঝা; তা'রা অভিশাপ এনেছে, বিপদ এনেছে। আমি নারীবিদ্বেষী নই যে, এই কথায় সায় দেবো; পুরুষবিদ্বেষী নই যে, ছেলেদের বিরুদ্ধে মেয়েদের উত্তেজিত ক'রে তুলবো। তবু এক কথায় এর মীমাংসা সহজ নয়।

আমার দিদিমা বলতেন, পথে নারী বিবর্জিতা। অর্থাৎ পুরুষের পথ বিচিত্র, মেয়েদের সেখানে ঠাঁই নেই। পুরুষ যুদ্ধ করে, হিমালয় অভিযান করে, বনে গিয়ে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে, সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় জাহাজডুবি হ'লে, আবার পৃথিবী জয় করতে বেরিয়ে পড়ে,—সুতরাং সেই সব পথে নারী বিবর্জিতা। মেয়েদের শক্তির ওপর শ্রদ্ধা অনেক

মেয়ের কম,—দিদিমারা নাতনীদের আদর করতেন, ভালো-বাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন না। আমরা বলি, পুরুষ যত বড় বীরই হোক, নারীর গর্ভেই ত তা'র জন্ম! অর্থাৎ কোথাও একটা গুপ্ত শক্তি আছে মেয়েদের—যেখান থেকে উঠে আসে আগুন আর ঝড়, উঠে আসে প্রাণের অফুরন্ত বন্যা এককালে পুরুষেরা ভবঘুরে ছিল, মেয়েরা দু'হাতে কাঁকন প'রে হাতছানি দিয়ে তাদের ঘরে ডেকে নিল! পুরুষকে দিয়ে তা'রা ঘর বাঁধার কাজ করিয়ে নিল, সন্তানের মা হ'য়ে উঠলো, আবার কাব্যে শিল্পে পুরুষকে দিয়ে নিজেদের স্তুতিবাদ লিখিয়ে নিল। পুরুষ নিজেদের মনে করে যথেষ্ট বুদ্ধিমান, মেয়েরা পুরুষকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান মনে করে না।

দিদিমা বলতেন, মেয়ে মাত্রেই ড়াকিনী আর ডাইনী! মাথায় একরাশি রেশমের মতন নরম নধর চুল, চোখের কোণে সর্বনাশিনী মায়া, গায়ের মাংস মখমলের মতন পেলব— আর পা দু'খানিতে পুরুষের জীবন-মরণ সমর্পণের বাসনা। সুতরাং দিদিমা বলতেন ডাকিনী। ডাইনী! ডাইনীরা যখন হাসে, পুরুষ মনে করে, কী মধুর স্বপ্ন! দিদিমা বলতেন, তোদের বোকামি দেখেই ওরা অমনি ক'রে হাসে। ওদের হাসি মানেই তোদের সর্বনাশ। আমি যে এসব কথা দিদিমার বকলমে নিজেই বলছি তা' নয়,—এই দিদিমাই আবার উপকথা আর রূপকথার আসর মাতিয়ে তুলতেন।

রাজপুত্র বনজঙ্গল, বাঘ ভাল্লুক, পাহাড়-পর্বত আর সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে চলেছে রাজার কন্যাকে জয় করতে। অর্থাৎ মেয়ের মত মেয়ে যদি হয় তবে রাজপুত্র তা'র জন্য প্রাণ দিতেও রাজি।

মেয়ের মতন মেয়ে মানে কী? দিদিমা বলতে পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যম্। তিনি বলতেন, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, সাবিত্রী ইত্যাদির কথা। অর্থাৎ যারা কেবলমাত্র সতীত্বনীতির ক্রীতদাসী নয়, যারা পুরুষের পক্ষে বোঝাস্বরূপ নয়, যারা ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রমহিমায় মহীয়সী—তা'রা। মেয়ের মতন মেয়ে যারা পুরুষের পাশে চলে—পিছনে চলে না। যারা সব কাজে পুরুষের মন্ত্রী, যারা পুরুষের প্রতিভাকে বাতাস দিয়ে জ্বালিয়ে তোলে, যারা পুরুষকে দুর্গমের দিকে উৎসাহিত করে—তাদের নাম শক্তি।

এবারে একটা ছবি তুলে ধরা যাক্। বিদেশ-ভ্রমণে যাচ্ছি ট্রেনে। সঙ্গে মেয়েছেলে। সব গাড়ীতেই ভীড়, অনেকবার ওঠানামা, সঙ্গে অনেক মালপত্র। নিজেকে সামলাবো, না মালপত্র, না মেয়েছেলে? ভীড়ের মধ্যে পুঁটুলি হারাচ্ছে ঘোমটা-দেওয়া মেয়েছেলে ছিটকে যাচ্ছে, কুলীদের নিয়ে কচকচি—এখন উপায়? ওদিকে গাড়ী বুঝি ছেড়েই দেয়। এদিকে পশ্চিমারা মারামারি বাধিয়েছে। তখন মেয়েছেলেদের নিয়ে কী বিপদ! অমনি দিদিমার কথাটাই

মনে পড়ে—পথে নারী বিবর্জিতা। ধরা যাক্ যুদ্ধে যাবো, না গেলেই নয়—দেশরক্ষার কাজে আমাকে নামতে হবে। এমন সময় মাতাঠাকুরাণী কান্না জুড়লেন, বউ এসে কাছা টেনে ধরলো, ঠাকুরমা, দিদিমা, মামীমা, পিসিমা—কপাল চাপড়াতে লাগলেন। যুদ্ধে যাওয়া কেমন করে হবে? দেখা যায়, মেয়েরা সব কাজই করিয়ে নিচ্ছে পুরুষকে দিয়ে। তা'রা ফরমাস করছে—নূতন ডিজাইনের সাড়ী তৈরী ক'রে দাও, ঠোঁটের রং কিনে দাও, পায়ের নূপুর গড়িয়ে দাও, যত পারো তত দাও। পুরুষ কেবল ছুটচে মেয়েদের ফরমাস নিয়ে। সমস্ত দেওয়ার পরও পুরুষের রেহাই নেই। মেয়েরা বলে, এবার আমাদের পাদ্য-অর্ঘ্য দাও, মধুর সম্ভাষণে কবিতা লেখো আমাদের নিয়ে। পুরুষ বলে তথাস্তু দেবি! এই কারণেই, পুরুষ যত বড় বর্বরই হোক না কেন, মেয়েদের কাছে তা'রা বিনয়নম্র।

পুরুষ ঘর বানিয়ে দেয়, কিন্তু ঘর পছন্দ না হ'লে মেয়েরাই সেই ঘর ভাঙ্গে। দিদিমা বলতেন, ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছেদ ঘটায় মেয়েরাই। বিয়ের আগে সবাই থাকে এক, বিয়ের পরে ভাই ভাই তফাৎ। দুই বন্ধুতে খুব ভাব, মাঝখানে মেয়ে এসে দাঁড়ালো—অমনি বন্ধু-বিচ্ছেদ। অনেক রাজবংশ নির্মূল হ'য়ে গেছে, অনেক রাজ্য ছারখার হয়েছে—তা'র গোড়ায় নাকি মেয়ে। দিদিমা বলতেন, "মরবে নারী

উড়বে ছাই, তবেই নারীর গুণ গাই!" সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয়—এই তিন শক্তি মেয়েদের মধ্যে আছে, তাই ওদের নাম দেওয়া হয়েছে দেবী। ওদেশে মেয়েদের কেউ দেবী বলে না, বলে, এন্‌জেল্—অর্থাৎ অপ্সরী! আমরা শ্রদ্ধায় বলি দেবী, ওরা বাসনার রঙে রাঙ্গিয়ে বলে, অপ্সরী!

আর একটি ছবি মনে করো। একটি তরুণ যুবক সবেমাত্র মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। তা'র চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন, তা'র মনে কত উচ্চাভিলাষ, প্রাণে কত দুরাশা! সে বড় হবে, ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নদৃষ্টি লাভ করবে, মানুষের মতন মানুষ হবে। ঠিক এমনি সময় হয়ত তা'র ঠাকুমা আদরের নাতিটির বিয়ে দিলেন। বছর না ঘুরতেই একটি ছেলে হোলো, এবং নিশ্বাস না ফেলতেই আর একটি কন্যালাভ করলো! গরীবের ছেলে, সুতরাং উপার্জনের কথাটা আগে। সেখানে ঠাকুমা দিদিমা কেউ নেই। ছেলেটি তখন সদাগরী আফিসে চাকরি নেয় পঞ্চাশ টাকায়। দু'টি সন্তান, স্ত্রী, নিজে এবং যদি থাকে মা কিম্বা ঠাকুমা,—কলকাতার বাসাভাড়া; তা'ছাড়া ডাক্তার-বদ্যি, হাতখরচ, ইত্যাদি ইত্যাদি। কোথায় সেই সুন্দর ভবিষ্যৎ, আর কোথা বা সেই উচ্চাভিলাষ? যুবকটি ধীরে ধীরে শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস হারায়, ভালবাসার ফাঁকি বুঝে নেয়, মেয়েদের মনে করে দুর্দশার বোঝা। তা'র দোষ দিতে পারিনে। এর ওপর যদি আবার স্ত্রী ঝগড়াটে

হয়, অবাধ্য হয়, কিম্বা কথায় কথায় তর্ক বাধায় তবে তো সোনায় সোহাগা! অনেক ছেলে মনে করে, তা'রা মস্তবড় কিছু একটা হ'তে পারতো, কিন্তু মেয়েরা হোলো তাদের পথের বাধা। অনেক পুরুষ বৃদ্ধ বয়সে খিটখিটে হয়, মেয়েদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়—তা'রা মনে করে, মেয়েছেলের সঙ্গে গার্হস্থ্য আশ্রমে ঢুকেই সর্বস্বান্ত হয়েছে। তাদের প্রাণ থেকে সব রস নিংড়ে নিয়ে মেয়েরা তাদের আখের ছিবড়ের মতন জঞ্জালে ফেলে দিয়েছে।

আসল কথা, পুরুষের হাত থেকে মেয়েরা যদি কিছু কাজ কেড়ে নেয় তবে মন্দ কি? এই যুগে সেই মেয়ের আদর, যার মস্তিষ্কটা পুরুষের। পুরুষরা অনেক কাল ধ'রে মেহনত করেছে, এখন তা'রা একটু ক্লান্ত। মেয়েরা তাদের কাজ কতকটা লাঘব করুক না কেন? যেটা অনড় আর অচল, সেইটিই বোঝা—মেয়েরা যদি একটু সজীব হ'য়ে নড়াচড়া করে, যদি কতকটা নিজের পায়ে দাঁড়ায়, যদি স্বতন্ত্র একটা মতামত গ'ড়ে তোলে, পুরুষ কতকটা স্বস্তি পেতে পারে!

তিরিশ বছর আগে প্রশ্ন করেছিলুম, আচ্ছা দিদিমা, বিয়ে করে মেয়ে, না ছেলে? দিদিমা বললেন, মেয়ে। প্রশ্ন করলুম, কিন্তু বর এলো যে বিয়ে করতে? দিদিমা বললেন, এইবার মেয়েটা ওর হাড় খাবে, মাস খাবে, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে।

কিন্তু মেয়ে ছাড়া পুরুষকে আমরা বলি লক্ষ্মীছাড়া—আর যে মেয়ের জীবনে পুরুষের ছোঁয়াচ নেই, তা'কে আমরা বলি প্রেতিনী। দু'টি আলাদা থাকলে সৃষ্টি রসাতল, দুটো এক হ'লে তবেই সব রক্ষে।

রাজসাহী জেলার একটি ছোট্ট রেল স্টেশনে এসে নামলুম। স্টেশনের কাছেই নদী, এবং ঘাটের অদূরে একটি সরকারী বাংলো; এধারে স্টেশন মাস্টারের দুটি কাঁচা-পাকা ঘর। এ ছাড়া এদিক ওদিক যতদূর দেখা যায়, নিঃঝুম নিঃসঙ্গ প্রান্তর, এবং ছোট ছোট দরিদ্র গ্রামের আভাস। আমি বলছি এই প্রায় বছর তিনেক আগেকার কথা।

আমি কলকাতার লোক—গ্রামের অভিজ্ঞতা আমার কম। প্রথমেই শুনলুম, এই বাংলোর আঙনে চাষীদের কাছে চাউল আর কাপড় বিতরণের ব্যাপার নিয়ে সম্প্রতি একটা দাঙ্গা হ'য়ে গেছে। কিন্তু দু'চার জন মেয়েপুরুষ যারা আমার চোখে পড়লো তাদের হাড় পাঁজরা গোণা যায়, এতই শীর্ণ এবং কঙ্কালসার! বুঝতে পারলুম না, এদের দাঙ্গা বাধাবার শক্তি এলো কোথা থেকে! তবে শুকনো কাঠ জ্বলে বেশী, একথা সবাই জানে।

টিকিটবাবু আমাকে বললেন, সে মশাই অনেক কথা, ফেরবার পথে যদি দেখা হয়, বলবো আপনাকে। খবরের কাগজে তুলে

দেবেন। আপনারা শহরের লোক, দেশ গাঁয়ের খবর কিছুই রাখেন না।

স্টেশনের নীচেই নদী—কিন্তু ফাল্গুন মাস না পেরোতেই জল ম'রে গেছে, কচুরীপানার চক্রান্তে নদীপথ বন্ধ। লগি ঠেলে কোনোমতে নৌকা নিয়ে হয়ত যাওয়া চলে। বহু বাক-বিতণ্ডার পর একখানা নৌকা ঠিক করা গেল। এখান থেকে ছয় ক্রোশ পথ আমাকে যেতে হবে।

নৌকার ছই ভাঙা—হাওয়ায় নড়চড় করে! কোনোমতে বাঁশ আর বাঁকারির সাহায্যে একটা ব্যবস্থা করা চলে। ভিতর দিকটায় জল চুঁইয়ে আসে, প্রত্যেক দশ মিনিট অন্তর জল ছেঁচে বাইরে ফেলতে হয়। এক সময় উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললুম, ওহে, কখন পৌছবে বল দেখি?

দু'টি লোক প্রাণপণে লগি ঠেলে কচুরীর বেড়াজাল কাটতে কাটতে বললে, বলতে পারিনে বাবু, রাত হবে। বিলের পথ দিয়ে যাবো,—সেই সন্ধ্যের পর।

সে কি হে, এখন বেলা যে সবে ন'টা!—এখানে দুধ পাওয়া যাবে কোথায় বলতে পারো?

দুধ!—বুঝতে পারা গেল লোক দু'টি মুখ চাওয়া-চায়ি ক'রে হাসলে। তারপর বললে, এদিকের গ্রামে কোথাও দুধ নেই, বাবু।

কেন?

গরু কোথায় যে দুধ পাবেন?

একজন বললে, নৈ-বক্‌না দু'দশটা আছে বাবু, বড় গরু নেই কোত্থাউ। কুড়ি টাকার গরু সব দুশো টাকায় বেচে খেয়েছে। নুননগরে চলেন, দেখি যদি পোয়াটেক দুধ পাই। চুপ ক'রে আমি ব'সে রইলুম। নিজের আহারের আসক্তিটায় যেন নিজেই অনেকখানি লজ্জা পেয়েছি। অদূরে দেখা যাচ্ছে গ্রামের ঘাটে কোথাও কোথাও চাষীরা বলদ নামিয়ে পার করাচ্ছে। মাঝে মাঝে নদীতে কচুরী আটকে চর উঠেছে, সেখানে কাক আর শকুনির দল ব'সে মরা জন্তুর ঠ্যাং টানাটানি করছে। সম্প্রতি আশপাশের গ্রামে নাকি কলেরা দেখা দিয়েছে। মাঝি আর মাল্লায় আমার নৌকা ঠেলছে প্রাণপণে। ঘণ্টাখানেক চলবার পর হঠাৎ নদীর তলাকার বালুতে আমার নৌকা আটকে গেল। অত্যন্ত বেগতিক আর দুর্যোগ—পৌঁছবার আশা বড়ই কম। এ অঞ্চলে না আছে গরুর গাড়ী, না পাল্‌কি—যানবাহনের কোনো সুবিধাই নেই। লোকে মুখ বুজে মরে, বিনা প্রতিবাদে বাঁচে।

গলা বাড়িয়ে বললুম, কি হে, নৌকো আট্‌কালো যে—

নৌকাওলা জলের ওপর নামলো, তারপর দু'জনে নানা কৌশলে ঝাঁকুনি দিয়ে আবার নৌকাখানা জলে ভাসাতে পারলো! একজন বললে, বাবু, মাঘ মাস থেকে আষাঢ় মাস এই দশা—কাজ-কারবার সবই বন্ধ থাকে। কদ্দিনে যে কিনারা হবে জানিনে।

প্রশ্ন করলুম, এ নদী কদ্দূর অবধি গেছে ?

এই ত বাবু ফরিদপুর আর খুলনা-যশোর যাবার রাস্তা—আর তেমন ভালো রাস্তাই নেই। কিন্তু ওই বছরে পাঁচ মাস পথ বন্ধ,—সোঁত কমে, এলেই কচুরীতে সব আট্‌কা। কে উপায় করবে বলুন !

এর পরেও ঘণ্টা দুই আমি ধৈর্য্য ধ'রে ব'সে রইলুম। মুননগরের এখন অনেক বাকি,—মাঝখানে অনেক পরিশ্রমের পর কেবল একঘটি খাবার জল পাওয়া গিয়েছিল। গ্রামে নাকি চিঁড়ে পাওয়া কঠিন, গুড় নাকি সব চালান হ'য়ে যায়। গরম কালে গাঙে অথবা বিলে কোথাও মাছ পাওয়া যায় না ; বছরের অন্য সময়ে মাছ যা কিছু পাওয়া যায়, সমস্তই রেল-গাড়ীতে চালান হয়। মিলিটারী কন্‌ট্রাক্‌টর নাকি চারদিকে ওৎ পেতে রয়েছে।

বেলা আন্দাজ বারোটার পর লগি ঠেলায় অপারগ হ'য়ে দু'জনের একজন বললে, বাবু নৌকা আর যাবে না, আমাদের মিথ্যেই হায়রানি হোলো।

ভীতভাবে আমি বললুম, পথ-ঘাট আমি কিচ্ছু চিনিনে বুঝলে ত ? কতটা রাস্তা এসেছি বলো দেখি ?

এসেছি আর কোথায় বাবু, এখনও আধক্রোশও হয়নি।

তোমরা কি আমায় নামিয়ে দিতে চাও ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা আর কি করবো ক'ন্ ?

বললুম, রাস্তা চিনে যেতে পারবো ?

তা'রা বললে, আপনি ওই গাঁয়ের ভেতর দিয়ে চলে যান, কোশ দুই গেলে অষ্টমিশের হাট পাবেন। তারপর পথ হোলো উত্তুরে—যাবেন সোজা। কোশ চেরেক আর বাকি থাকবে।

পাড়ের ধারে ওরা আমাকে নামিয়ে দিল। লোক দু'টি রোগা, কদাকার, উপবাসী—কিন্তু লোক দু'টি ভালো। তা'রা মিথ্যে বলে নি, কেননা এই অল্পকাল কচুরীর বেড়াজাল ভেদ ক'রে নৌকা নিয়ে অগ্রসর হওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়। আমি তাদের হাতে দুটো টাকা যখন দিলুম, তা'রা বললে, বাবু, টাকা ত দিলেন—কিন্তু চা'ল পাবোনা কোথাও, আজ হাট নাই।

কেন, ঘরে চা'ল নেই তোমাদের ?

দু'জনে হেসেই অস্থির। বললে, ক্ষ্যাত খোলা চলেনা, চা'ল কোথায় ? ময়লা চা'ল আসে হাটে তাই কাঁচি ওজনে এগারো আনা সের। ঘরে দুটো ওলাউঠো রুগী—

সে কি হে ?

হ্যাঁ, ওই যা' তা' খেয়ে ব্যামো আনে আর কি !

যাবার সময় মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ ক'রে বললুম, তোমাদের নাম কি ?

একজন বললে, হাতিমালি—অপরজন বললে, আমার নাম গুপী !—এই ব'লে সহাস্যে নিজের কণ্ঠীটি সে দেখিয়ে দিল।

একা চলেছি। পথঘাট কিছুই জানা নেই। কখনো এক বাঁশ বাগান, কখনো বা কারো খামারের ভিতর দিয়ে। পায়ে চলার একটা দাগ অনুসরণ ক'রে চললুম। অনেক জায়গায় দেখা যায়, লোকে ঘর-দোর ছেড়ে চ'লে গেছে; আবার কোথাও বা শীর্ণকায় দু'একটি বলদ আর খড়ের গোলা দেখে মানুষের চিহ্ন অনুভব করা যায়। কোথাও কোথাও আগামী কাল-বৈশাখীর আগে ঘর-দোর ছাওয়ার অল্পস্বল্প কাজ চলেছে। কিন্তু ছোটবেলা থেকে শুনতুম, গ্রামের কত ঐশ্বর্য, জীবনের কত প্রাচুর্য, কত বলিষ্ঠ নরনারীর দল,—চারিদিকে অগণ্য সম্পদের চিহ্ন। আমার কল্পনার সঙ্গে কোনকালেই গ্রামের মিল খুঁজে পাইনি। গ্রাম রয়ে গেল ঠাকুমা-দিদিমার গল্পে। আমার চেহারায় আর হাবভাবে শহরের পালিশ ছিল, সুতরাং জন দুই লোক আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে বললে, বাবু, কল্‌কেতায় নাকি যুদ্ধ হচ্ছে?

বললুম, না।

তা'রা বললে, যুদ্ধু থামবে কবে বল্‌তি পারেন?

হেসে বললুম, যারা যুদ্ধ করছে তা'রাও জানে না!

লোক দু'টি মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলো। আমি বললুম, এখানে কিছু খাবার কিনতে পাওয়া যায়?

তা'রা বললে, বসেন বাবু, একটু জিরিয়ে নিন্‌। একটু জল খেয়ে যান্‌।

আলাপ ক'রে জানা গেল, তা'রা ছ'দিন আগে হাটে গিয়ে এককাঁদি সবড়িকলা বেচে এসেছে দশ টাকায়,—আগে যার দাম ছিল টাকা দেড়েক। দশ আনার ধান বেচে এসেছে পনেরো টাকায়, আর একজোড়া কাপড় কিনে এনেছে পঁচিশ টাকায় কুণ্ডুদের ওখান থেকে। আট আনার মুরগীটা বিক্রি হ'য়ে গেল আড়াই টাকায়। আর ও-গাঁয়ের কলিমুদ্দির ছিল ক'টা গরু,—লাহুরাম বেনে এসে চারটে গরু নিয়ে গেল ছশো টাকায়।

ঘণ্টাখানেক গল্পের পর আমি বিদায় নিলুম। শোনা গেল, ক্রোশখানেক গিয়ে হাটতলা পেলে সেখানে নৌকার সুবিধা হ'তে পারে,—ওদিকের গাঙে জলও কিছু আছে। ফড়েরা হয়ত নৌকা ছাড়বে।

এবার সামনে পাওয়া গেল মস্ত বড় মাঠ। দেখতে পাচ্ছি চৈত্রের রোদ্দুর সহ্য করেই আমাকে যেতে হবে। কিছুদূর এসে দেখি ছ'টি লোক পথের একপাশে বোঝা নামিয়ে শুয়ে পড়েছে। সকাল থেকে এখন পর্যন্ত কারো পরণে সম্পূর্ণ একখানা কাপড় দেখি নি, কোন মেয়েছেলেকে দেখি নি তা'র সর্বাঙ্গে আবরণ ঝুলিয়েছে; শিশু, বালক ও বালিকা মাত্রই উলঙ্গ অথবা অর্ধনগ্ন—এইটিই যেন নিয়ম। এই ছ'টি লোকের পরণে গামছা,—তাও ছেঁড়া, তালি লাগানো। একটি লোক শুকনো মুড়ি চিবোচ্ছে, আর একজনের জ্বর এসেছে। এদের

নৌকা আছে, কিন্তু কচুরীর জন্য নৌকা বন্ধ। কোন্ জমিদারের কাছারিতে জিনিষপত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মাঝপথেই অসমর্থ—এগোতে পারছে না। কোনো সোজা পথ নেই,—কাঁচা পায়ে-চলা পথ কেবল এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে এই মাত্র। কোনোদিন ওদের পথ ছিল না, পথের কল্পনাও ওরা কেউ করে নি,—পথ-ঘাট যে আছে, এ ওদের জানাও নেই। রোদ্দুরের মাঠ,—মাটির ঢেলাগুলো পাথরের মত শক্ত, উঁচু-নীচুতে পা প'ড়ে সহজেই ক্লান্তি আসে। কিন্তু বেলা একটা বেজে গেছে, এর পর অষ্টমিশায় গিয়ে নৌকা ঠিক পাবো কি না তাও জানা নেই, সুতরাং সময় হাতে রেখে চললুম।

পথের আন্দাজ পাওয়া কঠিন। দূরের একটা অশ্বত্থগাছ, কিম্বা কোনো বাঁশঝাড় কোন একটা চিহ্ন—এই হোলো নিশানা। মাঠের মাঝখানে পথ হারাবার ভয় বেশী; ঘণ্টা দুই হাঁটলেও বোঝা কঠিন, ঠিক পথে চলেছি কিনা। একবার চাটমোহরের মাঠে গরুর গাড়ী নিয়ে আমার এই বিপদ হয়েছিল। যাই হোক বেলা আন্দাজ তিনটের সময় মাঠ ভাঙতে ভাঙতে পায়ে ফোস্কা পড়িয়ে গলা শুকিয়ে রোদ্দুরে মাথা ধরিয়ে আমি এক সময়ে অষ্টমিশার হাটে এসে পৌঁছলুম। তখন হাটের চিহ্নও নেই, কেবল খোঁজ-খবর ক'রে খানচারেক বাতাসা আর এক ঘটি ঠাণ্ডা জল কোনোমতে

পাওয়া গেল। শোনা গেল, দুধ, ঘি, গম, চিনি ইত্যাদির অভাবে এখানে অন্য কিছু খাদ্য পাওয়া সম্ভব নয়।

চোখে-মুখে জল দিয়ে একটু সুস্থ হ'য়ে এক চালাঘরের নীচে বসেছি, এমন সময় আমাদের শিবু চৌকিদার এসে হাজির। মহালজ্জিত হয়ে সে বললে, আপনার জন্য কোনো-মতেই নৌকা ঠিক করা যায় নি, কচুরীতে সব বন্ধ। তবে এখান থেকে বিলের ভেতর দিয়ে গেলে যদি সুবিধে হয়।

শিবুকে দেখে আমি একটু ভরসা পেলুম। কিছু আহারের সামগ্রী শিবু এনেছিল, কিন্তু স্নান না ক'রে কিছুই খেতে পারবো না। বাসায় পৌঁছে তখন দেখা যাবে।

শিবু বললে, দেশগাঁয়ের এই হাল, আপনার কত কষ্টই হোলো। অবশেষে জেলে-নৌকা একখানা ঠিক করা গেল। তা'রা যাবে কোথায় গুরুদাসপুরের ওদিকে কোন্ হাটে,—আমাকে তা'রা বসিয়ে নিল। শিবু সঙ্গে এলো না, সে কোন্ কাজে ব্যস্ত রইল। আবার আমি নৌকায় উঠলুম! রোদ্দুর লাগুক, অথবা ক্ষুধাতেই কাতর হই—মাঠ ভেঙে যে আর হাঁটতে হোলো না, এতেই আমি স্বস্তিবোধ করলুম। বিলের ভিতর দিয়ে নৌকা চললো, তারপর এলো একটা খাল,—সেখান পেরিয়ে আবার সেই নদী,—তবে এদিকে কচুরীপানা কম। এই বৈজ্ঞানিক যুগে সামান্য কচুরীপানা যে মানুষের সকলপ্রকার কার্যকলাপ এবং বিধিব্যবস্থাকে

অচল ক'রে দিতে পারে, এটি ভাবলেও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়। শুধু দারিদ্র্য আর অশিক্ষা নয়,—আজন্মের মূঢ়তা আর অযোগ্যতা আর অজ্ঞান—সর্বত্রই জড়িয়ে রয়েছে। উঁচু গলায় কেউ দাবি করে না, কঠিন হ'য়ে বাঁচার চেষ্টা কারো নেই,—জীবনযাত্রাকে নির্বিঘ্ন করবার চেষ্টাও কেউ করে না।

ডিঙি চলছে ধীরে ধীরে। জোরে চালাবার মানুষ কোথায়? এরা চলেছে মাছ ধরতে। গভীর রাত্রের দিকে গাঙের কোনো একটা অংশে কিম্বা বিলের কোনো এক প্রান্তে যদি জাল ফেলে বসতে পারে, হয়ত দু'চারটে কই-মাগুর কিম্বা ছোট চিতল অথবা বড় জোর এক-আধটা শাল-শোল মিলতে পারে। সেগুলো ওরা বেচবে কোনো হাটে,—সে হাটও অজানা। তারপর চাল চিঁড়ে কিনবে দু'এক সের; যাদের অবস্থা ভালো তা'রা হয়ত চারটি ডাল, কিম্বা একটু নুন,—নয়ত একটু ভেলিগুড়। ব্যস,—ওর বেশী আশা কেউ করে না। মাঠে ধান কলাই সরষে মটর—এসব হয় বটে; কিন্তু সেগুলো কাদের ওরা জানে না;—ফসল উঠলে ওরা ক'দিন খেতে পায় এই মাত্র।

ওরা শীতে কুঁকড়ে থাকে, গরমে থাকে অর্ধনগ্ন, বর্ষায় বিলে আর গাঙে ভিজতে থাকে। বাকি সময়টা ম্যালেরিয়া অথবা ওলাউঠায় মবে। জীবনটা ওরা এই ভাবেই সহজ ক'রে নিয়েছে।

কত কল্পনা করতুম ছোটবেলায়। ছোট নদীর দুই পাড়ে শাঁখ-ঘণ্টা বাজে, মন্দিরে মন্দিরে আরতি, গোলায় গোলায় ধান, গ্রামের আকাশ বাতাস কাব্যভাবে ভরা,—কত হাসি, কত কলকণ্ঠ, কত কীর্তন-কথকতা। তাঁতীরা তাঁত বোনে, কলু তেল তৈরী করে—ঘরে ঘরে ছানা মাখন, দুধ দই—কত মেঠাই মোণ্ডা, কত চিঁড়ে মুড়কি, কত কি! কিন্তু চোখে দেখছি চারদিক শূন্য রিক্ত,—চৈত্রের রোদের মতন গ্রামগ্রামান্তর ক্ষুধায় যেন হা হা ক'রে জ্বলছে। ফলের গাছ, সব্জির বাগান, ফুলের শোভা—কোথাও কিছু নেই। শুধু ভাবছি, এমন ক'রে কে সব কেড়ে নিল, কেমন ক'রে এমন সর্বনাশ ঘটলো? কারা দায়ি এ জন্যে?

জেলে-ডিঙির মধ্যে ব'সে ব'সে আমার সকল প্রশ্ন জলের আবর্তে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগলো,—কিন্তু উত্তর দেবার মতন মানুষ সেই ডিঙির মধ্যে কেউ ছিল না। নতুন মানুষের দল না জন্মালে এ প্রশ্নের জবাবও নেই।

ঘাটে এসে যখন আমাকে নামিয়ে দিল তখন সন্ধ্যা। দু'টি টাকা ওদের হাতে দিয়ে নেমে এলুম। চেয়ে দেখি, শিবু ইতিমধ্যেই এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাসিমুখে।

প্রশ্ন করলুম, কেমন ক'রে এলে, শিবু?

শিবু বললে, চাপড়ায় পথ ধ'রে সাইকেলে এসেছি,—কোশ দুই ঘুরে আসতে হয়।

নদীর ঘাট থেকে একটা পথ উঠে গেছে গ্রামের দিকে। কোন্ এক জমিদারের কাছারি আছে এই গ্রামে, তাই এ গ্রামের যৎকিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধ, নৈলে এর আর কোন পরিচয় নেই। পথটাকে পথ বলবো না, লোকের চলাফেরায় পায়ের দাগ প'ড়ে যাতায়াতের যে-সুবিধা হয়েছে, সেই অবকাশটুকুর নামই পথ। এখান দিয়ে গরুর গাড়ী আনাগোনা করে,—বর্ষাকাল থেকে প্রায় কার্তিকের শেষ পর্যন্ত এখানকার কাদায় গরুর গাড়ীর চাকা প্রায় সম্পূর্ণ ডুবে যায়। অন্য রাস্তা বানাবার উৎসাহ কারো নেই—কারো টাকা নেই, কল্পনা নেই, প্রাণ-শক্তি নেই।

গ্রামে এসে ঢুকতে আমার লজ্জা হচ্ছিল। যদি আমার সর্বাঙ্গে ধূলো আর নোংরা থাকতো, একটি ছিন্নভিন্ন কৌপীন ছাড়া গায়ে আর কোনো আবরণ না থাকতো, যদি খালি পা হোতো, কিম্বা চেহারাটা হোতো যৌবনেই জরাব্যাধিগ্রস্ত—তবেই এই গ্রামে আমাকে মানাতো। আমি যেন মূর্তিমান অহঙ্কার,—ওদের সামনে পরিচ্ছন্ন হ'য়ে এসে দাঁড়ানোটা যেন অপমানজনক। আমার সঙ্গে ওদের কোথাও ঐক্য নেই।

আকাশে অপরাহ্নের আলো এখনও রয়েছে, কিন্তু চারদিকের বাঁশবন আর ঝোপ-জঙ্গলে এরই মধ্যে ঝিঁঝিঁ

ডাকছে। ক্বচিৎ আশে পাশে এক-আধখানা চালাঘর, দু'-একটি গরীব গৃহস্থ, দু'-চারটি উলঙ্গ ছেলে-মেয়ে,—কিন্তু সমস্তটাই বিমর্ষ বিষণ্ণতায় ভরা। সর্বস্ব লুণ্ঠন হ'য়ে গেলে যেমন একটি নৈরাশ্য-স্তব্ধতা বিরাজ করে, ঠিক যেন তেমনি সবাই রয়েছে মুখ বুজে। যারা আমাকে দেখে স'রে দাঁড়ালো, কিম্বা উঁকি দিয়ে দেখে নিল, কিম্বা পরিচয়াদি নিয়ে গেল, তাদের মুখে চোখে যেন যুগ-যুগান্তরের বিষাদ, কোনোমতে যেন এ-গ্রামের অন্ন খুঁটে খেয়ে ইহ-জীবনের ঋণ শোধ ক'রে চ'লে যাবে এমনি একটি ভাব। তাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমি অনেক সময়ে কেমন একপ্রকার অপমানিত মুখে চুপ ক'রে গেছি।

হাটতলাটা গ্রামের কেন্দ্র থেকে একটু দূরে, কাছারি থেকে মিনিট দশেকের পথ। এখানে ওখানে দু-একটি খোল ভুসির দোকান, কেউ বা তেল-মসলা বিক্রি করে। সরষের তেলের মধ্যে সরষে ছাড়া আর সব পদার্থ রয়েছে, কালো দুর্গন্ধময়। বছরখানেক আগে কেউ কেউ নাকি এই হাটে চিনি বিক্রি হতে দেখেছে। কেরোসিন তেল আসে কেবল মাত্র কাছারির জন্য, বাকি সমস্ত গ্রামে কেরোসিন স্বপ্নবৎ। কাপড়ের একটি দোকানও দেখতে পাওয়া গেল, তবে সেখানে হাতে-বোনা গামছা ছাড়া আর কিছু বিক্রি হয় না ; মাস ছয়েক আগে কোন ভাগ্যবান ব্যবসায়ী নাকি খান দুইচার ধুতি আর শাড়ী আমদানি করতে পেরেছিলো। এখন সুবিধা হোলো এই,

পুরুষমানুষ গামছা পেলেই খুশী—এবং স্ত্রীলোকেরা লোক-চক্ষে বেরোয় না।

আমি একখানা গামছা নিয়ে পরীক্ষা করলুম, সে-খানা পরা অপেক্ষা মাছ ধরার কাজে বেশী লাগতে পারে। দোকানে মোটা থান পাওয়া যায়, তা'র গজ একটাকা দশ আনা। তবে গ্রামে এখন কলেরার প্রকোপ থাকায় কাপড়-চোপড়ের চাহিদা কম, চাউল বিক্রিও সামান্য।

পুরোনো বাঁশের খুঁটি দিয়ে হাটতলাটা তৈরী। তা'র একদিকের চালের অংশ কবে যেন ধ্বসে গেছে, সেখানে আর ঘরামি লাগে নি। বছর দুই আগ থেকে একটা গুজব আছে, রাজার লোক অর্থাৎ জমিদারের এজেন্ট আসবেন হাটতলা পরিদর্শন করতে, কিন্তু আজো তিনি এসে পৌঁছন নি। বর্ষার দিনে হাটতলায় এসে দাঁড়াবার আশ্রয় নেই। এখানে গরীব ফড়েদের ওপর নানাপ্রকার জুলুম হয়, তার প্রতিকারও কেউ করেনা,—সুতরাং হাটে আর বাজারহাট বিশেষ বসে না।

শিবুকে প্রশ্ন করলুম, মাছ পাবো কোথায় শিবু?

শিবু এখানকার চৌকিদার, সে সব খবর রাখে। এক গাল হেসে বললে, মাছ-মাংস এখানে কোথায় বাবু?

তবে?

মাছ পেতে গেলে সেই মঙ্গলবার—চাঁচকোড়ের হাট। তিন কোশ রাস্তা গেলে তবে চুনোপুঁটি যদি পান।

বললুম, তোমাদের গাঁয়ে এলুম, আমাকে তবে খাওয়াবে কি?
শিবু সহাস্যে বললে, ও গ্রাম থেকে সের খানেক দুধ রোজ এনে দিতে পারবো বাবু,—আর কি খাবেন বলুন?
কেন, ঘি?
ঘি খাবেন কলকাতায় গিয়ে, এখানে না। সাদাৎ মিঞার গরু ছিল ক'টা। গো-মড়কে গরুও গেল, আর সাদাৎ মিঞারা ঘর সুদ্ধ সব ম'রে গেল ওলাউঠায়। ঘি আর এখানে কেউ করে না, বাবু। আপনাকে এখানে কষ্টেই থাকতে হবে।
হাসিমুখে বললুম, এই তোমাদের সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলা?
শুদ্ধ ভাষা শিবুর বোধগম্য হোলো না। তবে নতমুখে বললে, হাটে লাউ এসেছে,—গোটা দুই লাউ আর চারটি কাঁচা আম নিয়ে চলুন ফিরি।
ফিরবার পথে প্রশ্ন করলুম, তোমাদের গ্রামে এখন কত লোক থাকে?
শিবু আন্দাজ ক'রে বললে, চার-পাঁচ হাজার ত বটেই।
এত লোক খায় কি?
শিবু বললে, সিরাজগঞ্জ থেকে নুন আসে, মাঝে মাঝে পিয়াজও পাওয়া যায়। তা'ছাড়া কলাই উঠে। বাবু আগে এতটা ছিল না, বছর তিনেক হোলো এই দশা।
চুপ ক'রে রইলুম। শিবু বললে, মহাজনদের জ্বালায়

কিছু পাবার যো নেই। তা'রা চর পাঠিয়ে চার আনার জিনিষ একটাকা দিয়ে নিয়ে যায়। টাকা ঘরে ঘরে, কিন্তু খাবার কিছু নেই। সব চ'লে যাচ্ছে কলকাতায়।

বললুম, কলকাতায় যায় ঠিক জানো?

শিবু বললে, গাঙ্গ আছে, রেলগাড়ী আছে—মাল যেখানেই হোক পাচার করে, বাবু।

কথা বলতে বলতে আমরা কাছারির কাছাকাছি এসে পড়েছি। শিবু এক সময় প্রশ্ন করলো, বাবু, কলকাতায় নাকি দুর্ভিক্ষ চলছে?

দুর্ভিক্ষ শব্দের অর্থটা শিবুকে বোঝাতে গেলে অনেকক্ষণ সময় লাগবে। আমি কেবল বললুম, হুঁ।

শিবু বললে, আমাদের এখানে আকাল চলছে, কিন্তু এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নেই।

শিবুর দিকে আমি তাকালুম। শিবু বললে, যুদ্ধ থেমে গেলে একবার আপনি আসবেন, আপনাকে ভালো ক'রে খাওয়াবো।

হেসে বললুম, তুমি আমি যদি বাঁচি ততদিন, তবেই আসবো।

শিবু চ'লে গেল।

এ গ্রামে কোথাও একটি জলাশয় নেই। গোটা তিনেক টিউবওয়েল আছে; কিন্তু তা'র একটি বুজে গেছে। ফাল্গুন

থেকে আষাঢ় অবধি নদীতে থাকে ক্ষীণধারা এবং বদ্ধজলা —সুতরাং কলেরা নিত্য-নৈমিত্তিক। এই দুর্গতিব মধ্যে গ্রামবাসীরা জীবন নির্বাহ করে। তা'রা প্রশ্ন তোলে না, এর চেয়ে কোনো স্বস্তিদায়ক জীবন আছে তা'রা জানে না; নির্বিঘ্ন হ'য়ে থাকা, পেট ভ'রে খাওয়া, সুস্থ শরীরে চলাফেরা, সচ্ছলতার মধ্যে বাঁচা—এসব ওদের কাছে গল্প।

গ্রামের মধ্যে দেখি নি কোথাও শাকসব্জির চাষ, তরী-তরকারির চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও নেই। বছরের একসময় ধান ও পাটের চাষ নিয়ে ওরা থাকে, বাকি সময়টায় ম্যালেরিয়া অথবা কলেরায় ভোগে, নয় ত সময় কাটায় মামলা-মোকদ্দমায়। ক্বচিৎ কোনো গৃহস্থের চালায় গোটা দুই চালকুমড়া, কিম্বা শিম ও শশার চারালতা, কেউ বা হয়ত ফলিয়েছে লাউডগা, অথবা বড়জোর একছড়া কলা। কিন্তু নুন ভাত এবং পিয়াজ ভিন্ন যে-কোনো খাদ্য প্রচেষ্টাই হোলো বিলাস, যাকে বলে—বড়মানষি।

মাঠের দিকে তাকিয়ে যতদূর দেখতে পাচ্ছি—সেই গঞ্জের হাট পেরিয়ে নদী ডিঙ্গিয়ে সেই বহুদূরের চলন বিল ছাড়িয়ে কোথাও আকাশের কোণে কোনো আশ্বাস অথবা কোনো সম্ভাবনা নেই। ধূ ধূ করছে ফসল-কাটা মাঠ, চৈত্রের কোনো ফসল নেই, মানুষের মনে কোনো দুরাশা নেই—কেবল রিক্ততা, কেবল অনড় উদাসীন জড়তা। যুগযুগান্ত ধ'রে এই নিরুপায়-

গ্রাম বেদনা ও দারিদ্র্যকে নিঃশব্দে বহন ক'রে চলেছে। এর থেকে মুক্তির কথা কেউ ভাবে না,—এই অপমৃত্যুর অন্ধকার কুণ্ড থেকে কে এদের তুলে ধরবে, কে দেখাবে আলোর পথ— তা'র কোন উদ্দেশ নেই।

একটি স্ত্রীলোক কাছারির টিউবওয়েল থেকে জল নিতে আসে। তা'র নাম রামের-মা। তা'র দু'টি ছোট ছোট ছেলে—রাম আর শ্যাম।

ছেলে দুটো রোজ ভোরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, আর ফিরে আসে সেই সন্ধ্যায়। কোথায় তা'রা খায়, কে খাওয়ায়, কোথায় যায়, কেমন ক'রে দিন কাটায়,—মা তা'র খোঁজ-খবর রাখে না।

উলঙ্গ দুটো ছেলে সারাদিন গ্রামের যেখানে সেখানে ঘোরে। রামের-মা কোনো কোনো বাড়ীতে ফরমাস খাটে, কারো রোগের সেবা করে, কোথাও বাসন মেজে দেয়,—কেউ দয়া ক'রে চারটি খেতে দেয়। রামের বাপ আছে, সে লোকটা বছরে দিন আষ্টেক ঘরামির কাজ করে, তাইতে কিছু পায় —বাকি সমস্ত বছরটাই বেকার। তবে মাঠের ধান ওঠবার সময় তা'র কতকটা কাজ জোটে। কয়েকদিন পেটটা ভ'রে খেতে পায়।

রামের-মা গ্রামের গৃহস্থদের বাড়ী থেকে নোংরা ন্যাকড়া সংগ্রহ করে, আর সেইগুলো কেঁচে জোড়া-তালি দিয়ে নিজের

পরণের কাপড় বানায়। সেদিন রামের-মা বাজার থেকে দেড় টাকায় একগজ মার্কিন কিনে একগাল হাসিমুখে বাড়ী ফিরলো। স্বামীর জন্য বানালো একটি জাঙিয়া, আর ছেলেত্নটোর জন্যে ছুটো লেংটি। এক একটি লেংটি পেয়ে ছেলেছুটোর কি আনন্দ! ওদের আনন্দ দেখে চোখে জল আসে। মোতাহার মিঞার বাড়ীতে কোন বউয়ের প্রসব-বেদনা উঠলো, রামের-মা'র ডাক পড়লো। হয়ত প্রসূতি বাঁচলো কিন্তু হয়ত নবজাত শিশুটি বাঁচলো না। প্রসূতির যত্ন নেই, উপযুক্ত আহার নেই, তদ্বিরতদারক নেই—

কিন্তু এ নিয়ে ভাববার মানুষ কোথায়? শিশু বাঁচলো না ওটা ভাগ্য, বিধিলিপি। কিন্তু গ্রামে রামের-মা ছাড়া দ্বিতীয় ধাত্রী নেই; সুতরাং রামের-মার হাতে যে কোন ফলাফলই হোক না কেন, তাকে না ডাকলে চলবে না।

গ্রামের ওই পথ-ঘাটে আমি বেড়িয়ে-বেড়াই একা একা। সেদিন গোলক এসে আমার পায়ের ধূলো নিয়ে দাঁড়ালো। বললুম, কি-হে, এখনো বেঁচে আছ?

গোলক বললে, জ্বরটা আর ছাড়তে চায় না, বাবু।

লোকটা অকালে বুড়ো হ'য়ে গেছে, বছর পঞ্চাশ হয়ত হ'তে পারে। গোটা ছুই শীর্ণকায় গরু আছে, আর কোথায় যেন বিঘা

দুই জমি। জাতিতে নমঃশূদ্র, রুগ্ন এবং অক্ষম। তিরু মিঞার বিধবাটা ওকে রেঁধে খাওয়ায়, রোগের সেবা করে, গোলক তা'কে খেতে দেয়।

বললুম, ওষুধ খেতে পারো না?

গোলক বললে, আপনি আর একবার মন্তর প'ড়ে দিন— ওতেই আমার গায়ের জ্বরটা যাবে। তা'র কথা শুনে আমি হেসে বাঁচিনে। একদিন তামাসা ক'রে তা'র মাথায় হাত দিয়ে বিজ্ বিজ্ ক'রে কি যেন বকেছিলুম,—তা'র পরদিন এসে গোলক জানালো, তা'র জ্বর ছেড়েছে। আমার ওই বুজরুকিতে সে বিশ্বাস করে, সে শ্রদ্ধা করে। অর্থাৎ অলৌকিক কোন ক্রিয়াকলাপ ছাড়া তা'র এই জরা-ব্যাধির যে আর কোন প্রতিকার নেই, এইটি সে আমাকে জানাতে চায়। অদূরে ফকির মিঞা দাঁড়িয়ে ছিল। দাড়িতে হাত বুলিয়ে বিজ্ঞের মতো সে বললে, দিন্ বাবু দুটো মন্তর আউড়ে, আপনার দয়াতেই গোলক আজ উঠে দাঁড়িয়েছে।

দেখতে দেখতে আরো দু'চারজন লোক এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো। ওদের ধারণা, আমি যে কোনো রোগ মন্ত্রের জোরে সারাতে পারি। কালিমুদ্দি বললে, বাবু, এবছর বৃষ্টিটা যেন একটু তাড়াতাড়ি আসে, এমন কিছু ক'রে দেন— এক ফোঁটা জল নেই কোথাও।

মোল্লা মিনতি জানিয়ে বললে, গোটা কতক বেগুনের চারা

দিছি বাবু,…তুটো মন্তর আপনি প'ড়ে দাও। আসর ভেঙ্গে দিয়ে আমি তখন পালাতে পারলে বাঁচি।

হালদারদের কতকগুলো লোক দূরের বিলে মাছ ধরতে যায় মাঝরাত্রে। ভোরবেলা তা'রা কই-মাগুর ইত্যাদি মাছ নিয়ে ফেরে। সমস্ত রাত ধ'রে পরিশ্রমের পর মাছ যা ওঠে, তাই বিক্রি ক'রে ওরা চা'ল কিনে আনে। কাঁচি ওজনের চা'ল এখন এক সের এগারো আনা। তারপর ডাঁটা কুড়িয়ে এনে তাই সিদ্ধ ক'রে ভাতের সঙ্গে খায়। এ অঞ্চলে তুর্ভিক্ষ হয় নি, ওরা বলে। কেবল খাদ্য-বস্তু তুষ্প্রাপ্য, আর কিছু না। শুকনো কুমড়ো পাতা ওরা কুড়িয়ে নিয়ে যায়; রামের-মা ভিক্ষা ক'রে আনে এক খাম্‌চা নুন। ওধারে বাঁশবন—তা'রই অন্ধকার কোণে কোণে জরাজীর্ণ চালাঘরগুলোর ভিতরে ভিতরে রুগ্ন উপবাসী জন্তরা থাকে—তাদের নাম নাকি মানুষ। সেদিন দিনের বেলায় একটি শিশুকে দাঁত দিয়ে কামড়ে শিয়ালে কোথায় নিয়ে গেছে। শিশুর মা ঘণ্টাখানেক কাঁদলো, তারপর সব চুপ।

আমি এসেছি গ্রামকে জানতে, এদের জীবনধারাকে অনুভব করতে। কিন্তু আমার প্রাণের সঙ্গে এদের যোগ নেই, এরা ভিন্ন জগতের লোক। এরা চাষ করে, ধান বোনে, ফসল ফলায়,—আমরা শহরে থাকি সুখে-স্বচ্ছন্দে। কিন্তু এদের ভিতরে এসে দাঁড়াবার জায়গা নেই, এদেরকে মানুষ ব'লে

ভাবতে ভয় করে। এরা দেশের লোক, আমার দেশের মাটিতে এরা বুক দিয়ে প'ড়ে থাকে,—এদের হৃদ্‌পিণ্ডের বিন্দু বিন্দু রক্তে এক একটি ধানের শিষ গজিয়ে ওঠে—তবু আমরা এদেরকে আত্মীয় ব'লে মনে করিনে। বহুযুগের অপমানে এরা অবনত, বহুযুগের অন্যায়ে এরা বংশ-পরম্পরায় উৎপীড়িত, কলঙ্কে মলিন, কিন্তু এদের সবাইকে তুলে ধরবার সময় কি আজো আসে নি? সেই মানুষের দল কোথায়, যারা এই পদদলিতের দ্বারে এসে নতজানু হ'য়ে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে বলবে, তোমরাই জাতির অন্নদাতা?

কাছারির ঠিক পিছনে উত্তর দিকে ধানের ক্ষেত আরম্ভ হয়েছে। তবে এখন মাঠে কোন চাষ নেই—খররৌদ্রে চারদিক ধূ ধূ করছে। দূরে দূরে দেখা যায় কোথাও কোথাও এক-আধখানা লাঙ্গল চল্‌ছে, পূবদিকে একটি টিলার উপরে একটি আমবাগান, সেখানে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাঁচাপাকা আম সংগ্রহ করে।

সম্প্রতি কয়েকদিন থেকে মাঠে লাঙ্গল চষা চলছে। চাষীরা নাকি আকাশের চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছে, দু'এক পসলা বৃষ্টি হতে পারে, যদিও অনাবৃত আকাশ সূর্যের আগুনে খাঁ খাঁ করে, মেঘের চিহ্ন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না—তবুও

এদেশের লোক আকাশের দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা লাভ করে, আকাশকে তা'রা আশা ও আকাঙ্ক্ষার আশ্রয় ব'লে মনে করে। পারিবারিক বিপদ, দেশের অজন্মা, জাতির দুর্ভাগ্য, মড়ক মন্বন্তর—সমস্তর প্রতিকার আর সমাধান তা'রা আকাশের কোঁণে কোণে খুঁজে বেড়ায়।

সকালের দিকে আমি মাঠের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। একজন মুসলমান চাষী একটি হাঁড়ি হাতে নিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে কি যেন বিজ-বিজ ক'রে বকছে। বুঝতে পারা গেল, লোকটা হাঁড়ির ভিতরে হাত রেখে মন্ত্র আওড়াচ্ছে। কিয়ৎক্ষণ পরে হাতের মুঠি সে উপর দিকে তুললো, হাতখানা এধারে ওধারে উপরদিকে নানাভাবে ঘোরালো, উত্তর-দক্ষিণ এবং পূব-পশ্চিমে খানিকক্ষণ ঘুরলো, একবার দুই হাঁটু নামিয়ে নমাজের ভঙ্গিতে বসলো,—তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়ে আর একবার মন্ত্র প'ড়ে নিল। এই প্রকার অনুষ্ঠানের পর দুই পা এগিয়ে সে হাতের মুঠোর বীজধানগুলো সামনের দিকে ছুড়ে দিল। পরে জেনেছিলুম, প্রথম বীজ-ধান ছড়ানোটা শুভ কাজ, এবং এইটিই হোলো নাকি রীতি। আমরা শহরের লোক, এসব আগে আমার জানা ছিল না।

এমনি ভাবে বিঘা পাঁচেক জমির সীমানার মধ্যে ঘুরে ঘুরে লোকটি প্রায় এক হাঁড়ি বীজধান ছড়িয়ে এক সময় তামাক ধরিয়ে বিশ্রাম নিতে বসলো। আমি ধীরে ধীরে তা'র দিকে

এগিয়ে এলুম। প্রশ্ন করলুম, আচ্ছা মিঞা, এই জমিটুকুতে কতটা ধান তুমি পাবে?

সে বললে, কর্ত্তা, আর্দ্ধেক ধানই ত পোকায় খেয়ে ল্যায়। পাবো কতটুকু? বড্ড জোর মণ পঁচিশেক?

বললাম, পোকা তাড়ানো যায় না?

হয়! ওরা জন্মায় মাটির তলায়! ঘুচুর ঘুচুর ক'রে ধানের গোড়া কেটে ল্যায়! তাড়াই ক্যাম্‌নে? গোবর পালি ত কথাই লাই, আরো বেড়ে ওঠে।

আমি চুপ ক'রে রইলুম। মিঞাকে একথা বোঝাবার চেষ্টা বৃথা যে, ওই সামান্য পোকা তাড়াতে না পারবার ফলে দেশের ও জাতির কত বড় সমস্যা তৈরী হ'য়ে রয়েছে। মাটির তলাকার বিভিন্ন প্রকারের কীট, অগণ্য পতঙ্গের লালাসিক্ত মুখ, কত রকমের পাখ-পক্ষী, সন্ধ্যাবেলার পর কত প্রকারের ছোট ছোট বিভিন্ন জানোয়ার—এদের সকলের উৎপাতের পর যে-ফসলটুকু পাওয়া যায়, তা'র পরিমাণ পরিশ্রমের তুলনায় কত সামান্য! তা'ছাড়া এই ফসলটুকু ঘরে ওঠবার পরও এর উপরে কত বিচিত্র দায়ধাক্কা। এই ধান বেচে দিতে হবে খাজনার টাকা, দেনার টাকা। তারপর আছে সমস্ত বছরের খাওয়া, গরুর জাব, ম্যালেরিয়ার ওষুধ, কাপড়, নুন, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, ঘর বাঁধার দড়ি, তামাক—সমস্তই ওই পঁচিশ মণ ধানের উপর বরাৎ। একটি পরিবারের

সর্বপ্রকার ব্যয়ভার বহন করার পক্ষে এই পাঁচবিঘা জমি যথেষ্ট কিনা—এ খোঁজ কেউ কোনদিন নেয় নি, কোনদিন নেবে কিনা জানিনে। অথচ ওই সামান্য একজন চাষীর হাতে রয়েছে দেশের জীবন-মৃত্যুর দায়িত্ব।

আমি আস্তে আস্তে বললুম, আচ্ছা মিঞা, ধরো, তোমরা সবাই মিলে একসঙ্গে আবাদ করলে,—তাতে ফসল বেশী পাওনা?

তামাকের হুঁকো থেকে মুখ তুলে মিঞা আমার দিকে তাকালো। তারপর বললে, জমি কই? লোক কই?

বললুম, সকলের জমি একসঙ্গে নাও?

হয়!—তামাকে টান দিয়ে মিঞা বললে, কয় যে ম'রে গেলে এক পালি খ্যার দিতি চায় না, গরুটোর চিতন্ যায় না খাইয়া, আর তুমি কও জমি নিবে একসঙ্গি···জল চল্‌বি উঁচুতে!

মিঞা বিরক্ত হ'য়ে অন্যদিকে মুখ ফেরালো। সহজে বুঝতে পারলুম না, এই সকল চাষীর কোন্ মর্মে আঘাত দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু ওর মুখ দেখলে বুঝতে পারা যায়, অসন্তোষের অগ্নিবাষ্প। যুগযুগান্ত ধরে মাঠের চাষী যে একটি অসহনীয় চিত্ত-পীড়া বহন ক'রে চলেছে, মিঞার মুখে-চোখে সেই চিহ্ন দেখে আমি সন্ত্রস্তভাবে স'রে এলুম।

কিছুদূর চ'লে এসেছি, লোকটা তখন পিছন থেকে বলছে, কাছারিতে যায়া কও দিকি চার আনা খাজনা মকুব করতে··· শুনবি লয়।

পিছন ফিরে চেয়ে দেখি লোকটা হাসছে। কিন্তু তা'র কালো দাড়ির ভিতর দিয়ে শাদা দাঁতের পাটি দেখে মনে হোলো, কেমন একটা হিংস্র ক্ষুধা!

এধারে নাবাল জমির পাশে আশস্যাওড়া আর বনকাঁটার জঙ্গল। ওর মধ্যে বনমুরগী আর গোসাপের বাসা,—সাপ এ অঞ্চলে প্রচুর। এর ঠিক নীচে বর্ষাকালে জল আসে, এবং কাছারির পাশে নৌকা এসে দাঁড়ায় ঠিক ঐ বাঁশবাগানের ধারে।

ওখানে গিয়ে দেখি, লাঙ্গল কাঁধে চড়িয়ে দুটো গরু দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ ধ'রে, আর পাশে একটি প'ড়ে রয়েছে। কাছে এসে দাঁড়ালুম। লোকটা মুখ ফিরিয়ে তা'র শীর্ণ মুখখানা কুঁচকিয়ে বললে, বড্ড জ্বর আইচে, বাবু।

বললুম, জ্বর নিয়ে কাজ করতে এলে কেন?

সে বললে, ক্ষ্যার্তে নামতি জ্বর আলো!

তোমার নাম কি?

ফইজুদ্দি।...আর, বাবু, এ বছরে আর জ্বর ছাড়তিছি না... দরগা থেকে মাদুলি আনুছি...কিছুই হয় না। জ্বরের জুন্যি আবাদও হয় নাই।

বললুম, তোমার ঘরে আছে কে, ফইজুদ্দি?

লোকটি তা'র কঙ্কালসার দেহখানা ফিরিয়ে বললে, আছে দুইটা বউ...পোলাপান আছে দু'গণ্ডা...

বললুম, ছু'বার বিয়ে করলে কেন হে ?

হয় ! কাজ কি কম বাবু ? ক্ষ্যাত ভাঙ্গে কে ? পান্তা কে আনে ? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আমি ফইজুদ্দির সমস্যার কথা ভাবছিলুম, এমন সময় সে পুনরায় বললে, বাবু সবই কাজের জন্যি। এই আষাঢ়ের আগে আমাকে আর একটা নিকা করতি হয়...নয়ত কাজ চলবি না···ধান আছে, পাট আছে, সজ্জি আছে···

তা' বটে। আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। লোকটার স্বাস্থ্য, শরীর এবং ভাবভঙ্গি মৃত্যুপথযাত্রীর মতন ···কিন্তু ছু'টি স্ত্রী জীবিত থাকতেও তৃতীয় নারীকে ঘরে আনতেই হবে, নৈলে কাজ চলবে না,—এমন অকাট্য যুক্তির প্রতিবাদই বা আমি কেমন ক'রে করবো ? সুতরাং বিমূঢ় বিস্ময়ে আমি এই চিররুগ্ন আষাঢ়ে বরটির দিকে তাকিয়ে রইলুম।

লোকটা চুপ ক'রে প'ড়ে রইলো। এক বছর যাবৎ তা'র জ্বর ছাড়ে নি, কিন্তু এজন্য তা'র কোনো দুর্ভাবনাও নেই। ঔষধ-পত্রের কথা সে চিন্তাও করে না—কারণ সে জানে মাছুলি ছাড়া আর কোনো ওষুধ নেই।

প্রশ্ন করলুম, আচ্ছা বেশ, গ্রামে না হয় ওষুধ পাওয়া যায় না, কিন্তু খাচ্ছ কি শুনি ?

ফইজুদ্দি বললে, পান্তা ছাড়া আর কি খাবো, বাবু ?

পান্তা ? জ্বরের ওপর ?

আজ্ঞে না, জ্বর বাড়লে আমানি খাই···পেট ঠাণ্ডা রাখে !

অসুখের পথ্য আলোচনায় আমার প্রশ্নের উত্তরে ফইজুদ্দি জানালো—ডাব, কমলালেবু, আঙুর, নাসপাতি—এমনি দু' একটি ফল সে দেখে এসেছে বছর বারো আগে—যখন সে মহকুমা শহরে গিয়েছিল এক মামলায়। কিন্তু কোনো ফল কিনে খাবার তখন সামর্থ্য ছিল না।

সে প'ড়ে রইলো একটি গাছের ছায়ার নীচে, আমি ভারাক্রান্ত মনে চ'লে এলুম। সেদিন খোঁজ নিয়ে জেনেছিলুম, এখান থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে কোনো ডাকঘরে মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনিন্ পাওয়া যেতো, কিন্তু সে-ব্যবস্থা বছর দুই আগে থেকে বন্ধ হ'য়ে গেছে। ফলে, এই জেলাতেই হাজার হাজার চাষী স্ত্রী-পুরুষ জ্বরে ও জরায় অকর্মণ্য। মাঠের পর মাঠ—হাজার হাজার বিঘা উর্বর জমি অনাবাদি হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে। কিন্তু এখন যুদ্ধের সময়, কুইনিন্ এখন কোনোমতেই পাওয়া যাবে না। খাদ্যের অভাবে রোগ, কিন্তু রোগের ওষুধ দুষ্প্রাপ্য ! এর প্রতিকার যুদ্ধ শেষ হবার আগে সম্ভব নয়।

এ গ্রাম থেকে প্রায় মাইল খানেক পশ্চিমে গেলে মোতাহার সাহেবের বাড়ী। গ্রামের সকলেই জানে মোতাহার সাহেব একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার, যদিও ডাক্তারী পাস তিনি কখনই

করেন নি। নানাবিধ ওষুধপত্র বেচাকেনার অভিজ্ঞতায় তিনি মোটামুটি বুঝতে পারেন—জ্বর,আমাশা, কলেরা এবং আরো দু' একটা রোগের ওষুধ মোটামুটি কোন্ কোন্ গুলো। এতেই তাঁর অসামান্য প্রতিষ্ঠা। দূরের গ্রাম থেকে তাঁর ডাক আসে,—মেঠো ঘোড়ায় চ'ড়ে তিনি রোগী দেখতে যান; তাঁর ফি হোলো দু'টাকা।

আমাকে দেখেই বললেন, এই যে, আসুন আসুন—এই দেখুন আমার অবস্থা! ওষুধের বাক্স আনতে না আনতেই ফরসা,—ইন্‌জেকশনের ওষুধ ঘরে একটিও রাখবার জো নেই,—কি করা যায় বলুন ত মশাই?

হাসিমুখে বললুম, ভালোই ত···আপনারই মরশুম।

মরশুম? বললেন ভালো! কলকাতায় অর্ডার পাঠাই···আর একটি বাক্স এসে পৌছতে একমাস দেড়মাস···রেল কোম্পানী মাল আনতে চায় না। যুদ্ধের জন্যে সবই গোলমাল। এমন করলে না থাকে ব্যবসা, না ডাক্তারী।

মোতাহার সাহেবের ওই একটি ঘরেই যা কিছু জিনিষপত্র থাকে। কেউ বলে ওটা মণিহারি দোকান, কেউ বলে বেনেমসলার, কেউবা বলে,—ডাক্তারখানা। সাবান, বিস্কুট, কেরোসিন, পান-সুপারী, তেলের মসলা ইত্যাদি সমস্তই পাওয়া যায়। যদি কেউ ঘর বাঁধবার দড়ি খুঁজতে আসে তাকেও খালি হাতে ফিরে যেতে হবে না।

যত দূর যাই

মোতাহার হলেন তালুকদারের ভাগ্নে—তালুকদারের এ অঞ্চলে মস্ত নাম ডাক। জোতজমি, ঘোড়া গরু, খাজনা আদায়ের গদি, এবং তিনি এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি। তালুকদারের স্ত্রী আছেন, কিন্তু সন্তানাদি নেই; ভাগ্নেই ভরসা! খুব সাদাসিধে মানুষ এবং কথাবার্তা খুব অমায়িক; পল্লীগ্রামের নিতান্ত ঘরোয়া বাঙ্গালী।

মোতাহার বললেন, মামার খাসে আছে চোদ্দ শো বিঘা ধানজমি, মামার ভাবনা কি বলুন? আমি কিছু আশা করিনে, তবে মামাকে যদি খুশী রাখতে পারি, আর উনি যদি হাত তুলে কিছু দেন, নৈলে নিজে আমি কিছু চাইবো না,—আপনি কি বলেন?

বললুম, আপনার মামা খুবই দয়ালু!

ওইটেই ত বিপদ। পাঁচজনকে দয়া করেন, কিন্তু কই ভাগ্নের দিকে চোখ পড়েনা। দয়াটা কেমন যেন বাইরের দিকে, ভেতরের দিকে নয়! অবিশ্যি আমি মুখ ফুটে কিছু চাইবো না।

বললুম, আপনার স্ত্রী কয়টি ডাক্তারবাবু?

মোতাহার সহাস্য বিনয়ে বললেন, দেখুন, দু'হাজার টাকার মাল এই দোকানে গচ্ছিত রয়েছে, এখনো দেনা শোধ হয়নি। একটির বেশী বিয়ে এখনও আমি করতে পারিনি। তা'ছাড়া ধরুন, মামার সম্পত্তি না পেলে ওসব এখন ভাবতেও পারিনে। তবে মুখ ফুটে আমি কিছু চাইবোনা কোনোদিন।

আমাদের গল্পের মাঝে মাঝে নানা লোক আসছে নানান্ জিনিষ কিনতে। মোতাহার নিজেই বিক্রেতা। একজন ইতিমধ্যে এসেছিল তামাক কিনতে, আর একজন দর ক'রে গেল করোগেটের টিন। এমন সময় দূরের গ্রাম থেকে একটি লোক হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এসে দোকানে দাঁড়ালো। মোতাহার প্রশ্ন করলেন, হয়েছে কি?

লোকটি বললে, আপনাগো প্রজা তিরু মিঞা···উয়োর বউটাকে সাপে কামড়ে দিছে।

কখন?

আজ ভোরে।

কি সাপ?

আজ্ঞে চক্কর আছে···বোড়া।

আমি প্রশ্ন করলুম, কেমন ক'রে কামড়ালো?

আজ্ঞে খড়ির ঘরে···কাঠকুটা নাড়তেছিল···দিছে ছুবলিয়ে।

বেঁচে আছে?

আজ্ঞে না···

মোতাহার বললেন, তবে এলে কেন?

লোকটি বললে, নতুন বৌটা কিনা···সেদিন বিয়া করছে —বলি যাই ডাক্তারকে খবর দিই···যদি একটা মাদুলি কিছু পাই।

ম'রে গেছে তবে মাদুলি কি হবে?

আজ্ঞে তিক মিঞার জন্যি···এই নিয়ে ওর দুটো বউ ম'লো। মোতাহার বললেন, আচ্ছা দেবো মাদুলি পাঠিয়ে···এখন যা। লোকটা সেলাম জানিয়ে চ'লে গেল। মোতাহার আমার দিকে চেয়ে বললেন, দেখলেন ত? এই দু'মাসে আঠারোটা গেল সাপের কামড়ে!

বললুম, এর কি কোন উপায় নেই?

উপায় আছে, কিন্তু সে-উপায় আমাদের হাতে নেই।

বাইরে একটি লোক তখন একটি ঘোড়া নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মোতাহার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এবার রুগী দেখতে যাচ্ছি —আসবেন কিন্তু আর একদিন—?

নমস্কার জানিয়ে আমি উঠে' দাঁড়ালুম। গল্প-গুজব আর হাসি-তামাসার ভিতর দিয়ে আমার ভিতরে কেমন একটা বেদনা জমে' উঠেছিল তা' বলতে পারবো না। তবে সমস্ত পথটা ধ'রে কল্পিত একটা বিরোধীতার প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছিলুম। এ চলবেনা, এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, সমস্ত ব্যবস্থাটা বদ্‌লে দেওয়া চাই, সমগ্র জীবনটাকে নতুন ক'রে ঢেলে সাজাতে হবে। নৈলে আর কোনো আশা নেই!

জমিদারের কাছারি বস্তুটি কেমন, এর আগে আমি এমন ক'রে জানতুম না। কাছারি মানেই ছোটখাটো একটি গভর্ণমেণ্ট—এবং সেখানে যারা থাকে, অথবা সেখানকার সঙ্গে যাদের যোগ আছে, তা'রা হোলো সরকারি লোক।

কাছারি যদি স্থানীয় লোকের কাছে জনপ্রিয় না হয় ক্ষতি নেই—কিন্তু কাছারিকে শ্রদ্ধা করতে হবে, ভয় করতে হবে। কাছারিতে প্রায়ই সরকারি লোক আসে, অর্থাৎ জমিদারি প্রতিষ্ঠানের বড় বড় কর্মচারিরা আসেন। তাঁরা যখন আসেন তখন খানাপিনা আরম্ভ হয়—এর ঘর থেকে মুরগী আসে, ওর ঘর থেকে আসে দুধ-মাখন, তা'র ঘর থেকে আসে টাটকা ফল-মূল, অথবা সকালের শিশির-ভেজা তরি-তরকারি। তাঁদের আরামের নানা উপকরণ, তাঁদের সুখ-সুবিধা ও সাচ্ছন্দ্য সমস্তই নায়েব মশাইকে যোগাতে হয়। যদি পান থেকে চূণ খসে, যদি কোথাও ত্রুটি প্রকাশ পায়, তবে আর রক্ষা নেই—কেউ হবে অপমান, কেউ লাঞ্ছনা সইবে, কারো বা বেতন কাটা যাবে।

আমি খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলুম, এই তালুকের আয় বছরে প্রায় বত্রিশ হাজার টাকা। বহুকাল থেকে প্রতি বছরে এই টাকাটা খাজনাস্বরূপ প্রজাদের কাছে আদায় করা হয়। কেউ বলে দেড়শো বছর হোলো, কেউ বলে দুশো বছর হ'তে চললো। এ একটা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা পুরুষানুক্রমেই চলেছে। যারা এই ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছে, তা'রাও জানে—রাজার খাজনা বংশপরম্পরায় দিয়ে যেতে হবে, প্রতিবাদ করার উপায় নেই। প্রতিবাদ মানেই রাজদ্রোহিতা। আমি খোঁজ নিয়ে জানলুম, স্বয়ং জমিদার

তাঁর এই তালুকে জীবনেও একবার পদার্পণ করেন নি—তাঁর বাপ এবং ঠাকুরদা দাও নয়। এই তালুক তাঁর জমিদারির অন্তর্গত, এটি হয়ত তিনি খাতাপত্রেই জানেন। কিন্তু তাঁর এই বাৎসরিক বত্রিশ হাজার টাকা যাদের কাছ থেকে নিয়মিত আদায় হয়, তাদের একজনকেও তিনি কোনোকালেই জানেন না। তাঁরা জমিদার, তাঁরা থাকে কলকাতার অভিজাত পল্লীতে,—মস্ত তাঁদের বাগান-বাড়ী, মার্বেল পাথরের দালান, বাগানে জলের ফোয়ারা,—তাঁদের মোটরের মধ্যে গদির উপরে মখমলের বালিশ,—তাঁরা সুখী, নির্লিপ্ত, শান্তিপ্রিয় নাগরিক,—তাঁদের কানে গ্রামের কোনো সংবাদ যাতে না পৌঁছয় তা'র সুব্যবস্থা আগে থেকেই করা আছে। সমস্ত গ্রামের মধ্যে একটিমাত্র জলাশয়—সেটি কাছারির সংলগ্ন। অর্থাৎ কাছারিতে যদি কখনও কেউ আগুন লাগায়, অথবা কাছারির খাজনা আদায়কারী লোকেরা যদি কখনও জলের অভাবে বিদ্রোহ করে, কিংবা উচ্চতম কর্মচারীরা যদি টাটকা মাছের অভাবে দুঃখিত হয়—এই জলাশয়টি রাখা সেই কারণে। এবং পরে আমি ভ্রমণ ক'রে দেখেছি ধানের ক্ষেত ও বর্ষার বিল ছাড়া প্রায় কুড়ি মাইলের মধ্যে একটিও পুষ্করিণী নেই। প্রবল গরমের সময়েও মাঠের গরু দিনান্তে কোথাও একবার জল খেয়েছে, এমন দৃশ্য আমার চোখেই পড়ে নি। এটি আর কোনো আজগুবী দেশ নয়

—রাজসাহী জেলার একটি প্রসিদ্ধ মহকুমা। গ্রামবাসীরা সুধু আকাশের মুখ চেয়ে থাকে, কবে বৃষ্টি নামবে, কবে তাদের ঘরের কূয়াগুলো ভরবে, কবে ধানক্ষেতের রংটি হবে সবুজ। গরুগুলো বাঁচবে, একমুঠো অন্ন লোকের মুখে জুটবে, জমিদারের খাজনা শোধ করার আশ্বাস পাবে।

আজ কয়েকদিন থেকে রাত্রে ও ভোরে গ্রামে কীর্তনের দল বেরোচ্ছে। খোল আর করতাল সহযোগে নামগান চলেছে নিয়মিত। পাটের দল, নমঃশূদ্র, মুসলমান, অন্যান্য চাষী—সকলেই যোগ দিচ্ছে। জানা গেল, বৃষ্টির দেবতা কুপিত হয়েছেন, কলেরায় গ্রাম উজাড় হ'তে চললো, ঘরে ঘরে জ্বর আর আমাশা, সুতরাং নামকীর্তন না করলে আর উপায় নেই। ধান এবং পাটের চারাগুলো রোদে পুড়ে লাল হ'য়ে গেছে, নদীতে জলের বদলে কাদা, লাউ আর কুমড়ার লতাগুলো শুকিয়ে ঝ'রে যাচ্ছে,—সুতরাং ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানানো দরকার। গাঁয়ে পাপ জমেছে, প্রায়শ্চিত্ত না করলে চলবে না।

মোল্লা আমাকে বলে, এই ত হ্যাখেন দাদাবাবু, দেবতায় না দিলে মান্‌ষের ক্ষ্যামোতা কতটুকু ?

আমি বললুম, দেবতার আশায় না থেকে গোটাকয়েক কাটো না কেন মোল্লা ?

মোল্লা হেসেই খুন। বলে, ওই কথাই কয় কে! মাজায় জোর

নাই, কোদাল ধরবি কে? গেল চৈতে চাল উড়ে গেছে এই চৈতও চালে খ্যার দেয় না,—ওরা কি আর মনিষ্যি? ওই ছ্যাখেন, ঘরে শুয়ে ওলাউঠোয় মরবে, তবু জ্ঞানগম্যি হবে লয়। এবার যে ক্যাম্‌নে চৈত কিস্তি আদায় হবে, তা' কইতে পারি নে।

বললুম, আচ্ছা মোল্লা, সবাই যদি মরে তবে খাজনা আদায় হবে কেমন ক'রে?

মোল্লা হেসে একেবাবে আকুলিবিকুলি। বললে, মান্‌ষে ম'রে গেলে জমি ত যাবি লয়,—এ বাবা রাজার খাজনা, শেয়াল-কুকুর বাঁচি থাকলি তাদের কাছ থিকি আদায় করবি। দাদাবাবু, এ জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না। সেটা দুর্ভিক্ষের বছর। মোল্লা আমাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা দাদাবাবু, কলকাতায় নাকি খুব লোক মবছে? কয় যে পথে পথে লোক ম'রে থাকে?

বললুম,দুর্ভিক্ষ হ'লে তাই ত হয়।

মোল্লা কিয়ৎক্ষণ কি যেন ভাবলো। তারপর স্বস্তি.. সঙ্গে বললে, রামরা বাঁচে গিছি, এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নাই। কই দুর্ভিক্ষ ত কেউ কয় না।

বললুম, কিন্তু এখানে এত লোক মরছে কেন?

ওই যে কইলেম·· ওরা মনিষ্যি নয়! দুধ নাই, ঘি নাই, ফলপাকড় শাকশব্জি নাই,—কেবল ওই পচা আমানি খাইয়া

মাঠে গিয়া রোদ্দুরে কাম করে,—তাই মরে ওলাউঠোয়। একঘটি খাবার জলও ত নাই! দাদাবাবু, এ গাঁয়ের কথা আর মনিষ্যি সমাজে কয়েন না।—যাই এবার কাছারিতে, কি যেন গোলমাল বাধাইছে।

এখন কিস্তি আদায়ের কাল। কাছারিতে গণ্ডগোল লেগেই আছে। বরকন্দাজ গিয়ে দূরের মাঠ থেকে লোক ধ'রে আনে,—অনেকে নাকি গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে। জমি নিলামে ওঠে, কিংবা মামলা বাধে, কিম্বা শমন জারি হয়,—তখন সেই অপরাধীর টনক নড়ে। ছুটতে ছুটতে এসে নায়েব মশায়ের পা জড়িয়ে ধরে। কোনো কোনো চাষী অথবা প্রজা বরকন্দাজকে ভাগিয়ে দিয়ে বলে, যা মন যায় করগা। আল্লার মাটি, তাল্লার জল, চাষ ক'রে খাই—খাজনা দিব ক্যান্?

বরকন্দাজ ফিরে আসে।—

কেউ গোমস্তা, কেউ পাইক, জমাদার, জমাননবিশ, হিসাব-নবিশ,—কিন্তু সমগ্র কাছারির শাসনতন্ত্রটা চলে মাসিক বেতন নীতির ওপরে নয়,—গোপন সুড়ঙ্গপথে টাকাকড়ির আনাগোনায়। অর্থাৎ কেউ দেয় সেলামী অথবা নমস্কারী, কেউ পায় বিদায়ী অথবা বকশিশ, কেউ বা নজরানা অথবা পাওনা। ফলে যারা মাইনে পায় পনেরো টাকা, তাদের রোজগার পঞ্চাশের ওপর। কাছারির সমস্ত লোককে

সর্বদা প্রসন্ন না রাখলে চাষীর জীবন অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে; পদে পদে বিপদ তা'র ; পদে পদে লাঞ্ছনা।

কাছারির পুকুর শুকিয়ে গেছে ; বৈশাখের শেষেও আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই। ভোরবেলা দেখি গ্রামেব স্ত্রীলোকেরা এসেছে পুকুরে। পুকুরে কাদা আব পাঁক,—কিন্তু সেই ঘোলাজলে স্নান তাদেব করতেই হবে। কঙ্কালসাব রুগ্ন মেয়েদের দল, পবণে শতছিন্ন লজ্জা-বাস, কোলে কাঁকালে উলঙ্গ শিশু। কত মেয়েব অপমৃত্যু ঘটেছে, তা'র অস্পষ্ট কাহিনী ওই পুকুরঘাট থেকে আমার কানে আসে। এথাকার মেয়েরা নিঃশব্দে বেদনা ও দারিদ্র্যকে বহন করে, বিনা প্রতিবাদে একদিন সকল জ্বালা জুড়িয়ে মরে। পুরুষবা আবাব ভিন্ন গ্রাম থেকে বিয়ে ক'রে ঘরে বউ আনে।

পুকুরেব ওপারে ওই বিশাল অশ্বত্থেব মাথায় এসেছে ভোরেব পাখীরা। দোয়েল, শ্যামা, কাঁদাখোঁচা কত চোখ গেল আর পাপিয়াব দল। কাছারির পাশে কৃষ্ণচূড়া রক্তেব মতো রাঙা হ'য়ে উঠেছে,—ওটি যেন সমগ্র গ্রামের বেদনাব প্রতীক। শান্ত স্তব্ধ গ্রাম, তা'র উপরে আকাশে অনন্ত শান্তি। প্রথম সূর্যের রাঙা আলো নেমেছে ধীরে ধীরে, বাতাস মৃদু স্নিগ্ধ। এই অপরূপ পল্লীপ্রকৃতির নীচে মানুষের করুণ দারিদ্র্য আর অপমৃত্যুর ইতিহাস লেখা চলেছে। নগরে নগরে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, কত রাজনৈতিক দলাদলি, কত

সামান্য তর্ক নিয়ে কত বৃহৎ হানাহানির পালা। কিন্তু গ্রাম কি তাদের কাছে কিছু নয়? এই যে মাতৃরূপিণী গ্রাম সমগ্র দেশে মুখে অন্ন জোগায়,—রাজনৈতিক দলাদলির বাইরে এই উপবাসী বিবস্ত্রা রুগ্না জননীর কি কোন ঠাঁই নেই? এখানে এসে দেখছি মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু, জীবনকে নিয়ে অকথ্য অনাচার আর দুর্নীতি, অপমানিত দারিদ্র্যের অন্তরে বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, অনাহারক্লিষ্ট রুগ্ন প্রাণধারণের অসহনীয় আত্মগ্লানি! সমস্তটা দেখতে দেখতে আমি অস্থির হ'য়ে উঠেছি।

সম্প্রতি এখানকার কাছারিতে নতুন নায়েব বদলি হ'য়ে এসেছেন। কাছারির পুকুরের ধারে তাঁর বাসা। নতুন নায়েব নানা জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করেছেন, সুতরাং তিনি অভিজ্ঞ লোক। তাঁর হাতে মালখানার চাবি, তাঁরই উপর কাছারির দায়িত্ব। তিনি বলেন, সমস্ত দায়িত্বের গোড়াকার কথা হোলো টাকা। কাছারি হোলো টাকা আদায় করার এজেন্সি। সমস্ত টাকাটা ঠিক সময়ে আদায় ক'রে পাঠাতে হবে,—এ ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। যেদিন এ কাজের অযোগ্য হব, সেইদিন চাকরি যাবে।

বললুম, কিন্তু যোগ্যতার মূল্য?

মাসে বত্রিশ টাকা।

উপরি কিছু নেই?

উপরি মানেই বেআইনী উপার্জন। কিন্তু সেটা আজকাল নেই। চাষীরা এখন আর বোকা নয়।

বললুম, কিন্তু শুনতে পাই কুড়ি টাকা মাইনের নায়েবেরা নাকি এক সময় জমিদারি ফেঁদে বসে ?

নায়েব মশাই বললেন, কথাটা আগে সত্যি ছিল, এখন মিথ্যে। দেশগাঁয়ে কিছু নেই, ঐশ্বর্য নেই, প্রাচুর্য নেই। এখন চাষীদের ভাত-কাপড় জোটে না। সমস্ত বছর ধ'রে ওদের রোগ আর আলস্য,—সমস্ত বছর ধ'রে গো-মড়কে গরু মরে।

বললুম, কিন্তু খাজনা ত ওরাই দেয়।

তিনি বললেন, ওরা দেয় না, আমরা আদায় করি। রক্ত যখন টানতে পারি নে, তখন শাদা রস টেনে বা'র করি।

আপনি যদি এতই জানেন, তবে একাজ করেন কেন ?

নায়েব মশাই হাসলেন ; বললেন, আমি পাকা লোক, তাই আমার দাম। আমি ওদের মন ভোলাতে পারি, ফন্দি আঁটতে পারি, নানা কৌশলে ওদের বাধ্য করতে পারি,—তাই আমার দাম। যেখানে খাজনা আদায় হ'তে চায় না, সেইখানে আমাকে বদলি করে। আমার এই যোগ্যতার দাম বত্রিশ টাকা।

বললুম, কিন্তু একাজ আপনার ভালো লাগে ?

তিনি বললেন, পচা মড়ার ওপর শকুনি বসে—সেইটি তা'র স্বভাব।

কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললুম, কিন্তু আপনারা ত গ্রামের সেবা কিছু কিছু করতে পারেন। জলের অভাব, রোগ, অশিক্ষা—

নায়েব মশাই তা'র ঘোলাটে পাকা চোখ তুলে বললেন, কে করবে ?

ধরুন, আপনাদের জমিদার ?

জমিদার যদি গ্রামের সেবা করতে আসে তবে তাকে দেউলে হতে হবে। তা'তে জমিদারিও যাবে, গ্রামের সেবাও হবে না। জমিদারের চেয়েও যারা বড়, কেবল তা'রাই উন্নতি করতে পারে, আর কেউ নয়।

বললুম, কিন্তু তা'র কি কোনো সম্ভাবনা আছে ?

নায়েব মশাই বললেন, না।

তবে এদের ভবিষ্যৎ কি ?

দেশব্যাপী মহামৃত্যু, প্রতিবছর দুর্ভিক্ষ, নিত্য অরাজকতা।

আমাদের আলাপের মাঝখানে গ্রামের রোগী স্ত্রী-পুরুষরা এসে নায়েব মশাইয়ের দরজায় দাঁড়ায় ; কারো পায়ে দগদগে ঘা, কেউ আমাশয় ব্যাধিগ্রস্ত, কারো বা আজ তিনমাস হোলো জ্বর ছাড়ে নি। একটি লোক একপাশে দাঁড়িয়ে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদছে প্রায় আধঘণ্টা। আমি প্রশ্ন করলুম, কাঁদে কেন ?

নায়েব মশাই উঠে' দাঁড়িয়ে তা'কে তাড়না করলেন—যাও, যাও এখান থেকে,—যাও, এখানে কোঁদো না, এটা কাঁদবার জায়গা নয়!—পরে আমার দিকে চেয়ে বললেন, পাগল কিনা বুঝিনে, যখন তখন এসে কাঁদে।

আমি স্তব্ধ হ'য়ে রইলুম। নায়েব মশাই রোগীদের লক্ষ্য ক'রে বললেন, কি ওষুধ দেবো তোমাদের বলো ত? খাওয়ার অনাচার করলে কোনো ওষুধই ধরবে না।—তোমার কি হয়েছে হে?

একটি রোগা রক্তহীন যুবক সামনের দিকে এগিয়ে এলো। কান্নার বিকৃত মুখে বললে, বৌটা বুঝি বাঁচে না!

নায়েব বললেন, মেয়েমানুষের বাঁচবার কথা নয়। হয়েছে কি?

জ্বরে জ্বরে হায়রাণ, কাল রাত থেকে দাঁতি লেগে আছে!

যুবকটির দিকে নায়েব তাকিয়ে বললেন, তোমার যা অবস্থা, বৌটার আগেই তুমি যাবে! তোমার নাম কি?

ছোকরা বললে, নোছেরালি!

নায়েব একবার নিরাসক্ত দৃষ্টিতে অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের কি শুনি? কেউ বললে জ্বর, কেউ বললে ওলাউঠো, কেউ বা নায়েবকে নাড়ি দেখাবার জন্য হাতখানা এগিয়ে আনলো। একজনের পায়ের ঘায়ে পচ ধরেছে। কারো শিশুর কাসতে কাসতে দম আটকে যায়, কোনো বউ পেটের ব্যথায় ছটফট করে। নায়েব মশাই সমস্ত বিবরণ

শুনে একবার ভিতরে গেলেন। তারপর বাইরে এসে বললেন, কলকাতায় হোমিওপ্যাথী ওষুধের অর্ডার পাঠিয়েছি,—কিন্তু এখন যুদ্ধের সময়—কবে ওষুধ আসবে জানি নে। তোমরা এখন যাও।

স্ত্রী-পুরুষরা নির্বাক মূঢ়তায় অনেকটা অচেতনের মত ব'সে রইলো। ইতিমধ্যে সেই লোকটা আবার এসেছে দরজার গোড়ায়, আবার কাঁদে ডুক্‌রে ডুক্‌রে। সমস্ত গ্রামের করুণ কান্না তা'র গলায় যেন ফুঁপিয়ে ওঠে।

গ্রামখানি ছেড়ে এবার আমার চ'লে যাবার সময় হয়েছে। অনেকদিন ধ'রে এগ্রামে ওগ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি—কোথাও ভাল লেগেছে, কোথাও ব্যথা জমেছে, কোথাও বা মন দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু গ্রাম আমার জন্মভূমি নয়, আমি শহরের মানুষ,—আমাকে এখানকার দেনাপাওনা চুকিয়ে এবার শহরে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু মনের কোণে কোথায় একটি মমত্ব-বোধের চেহারা আবিষ্কার করছি, কেমন যেন একটি করুণ আত্মীয়তা অনুভব করছি,—এ আমার জন্মভূমি নয়, তবু এ গ্রাম আমার। যেখানে যত গ্রাম আছে—সমগ্র ভারতে, এই বিরাট মহাভারতে—আমি যেন ছড়িয়ে রয়েছি সেই লক্ষ লক্ষ গ্রামে। যেখানে যত উৎপীড়ন, যত শোষণ, দারিদ্র্য আর বেদনাময় জীবন, দেশের যত অপমান আর অধঃপতনের

কাহিনী—যেন সমস্তটাই আমাকে জড়িয়ে রয়েছে। আজ তাই রাজসাহী জেলার এই ছোট্ট মুসলমানী গ্রামটিকে ছেড়ে যাবার আগে কেমন একটি বেদনা বোধ করছি, তা'র কোনো অভি-ব্যক্তি খুঁজে পাই নে।

এ কয়দিন যারা দূরে দূরে ছিল, তা'রা আমার কাছাকাছি ঘোরা-ফেরা করছে। আমাদের বুড়ো মোল্লা, ফইজুদ্দি, ডাক্তার মোতাহার, শিবু, হাতিমালি—সকলেই যেন কিছু বিমর্ষ। ওরা একদিন আমাকে ধ'রে বসলো, ইস্কুল বাড়ীটা একবার দেখে যেতে হবে আপনাকে। তালুকদার সাহেব ইস্কুল বাড়ীটা নিজেই তৈরী ক'রে দিয়েছেন।

কাছারির কোল ঘেঁষে একটি কাঁচা রাস্তা চ'লে গেছে গ্রাম ছেড়ে ভিন্ন গ্রামের দিকে। এই পথটার দু'ধারে বাঁশের জঙ্গল ঘন হ'য়ে থাকে, এবং দিনের বেলাকার অন্ধকারে শিয়াল আর সাপ চ'রে বেড়ায়। বর্ষাকালে পথটি ডুবে যায় প্রায় চার-পাঁচ মাসের মতন। কিন্তু এই একটি মাত্রই পথ, সুতরাং রাজপথ। এখান দিয়ে আন্দাজ আধ মাইল গেলে একটি উঁচু টিলার উপরে তালুকদার সাহেবের ইস্কুল।

টিনের চালা, ছেঁচা বাঁশের বেড়া এবং মাঝে মাঝে কাঠের খুঁটি—এই দিয়ে সেই পাঠশালা তৈরী। মাঝখানে মস্ত উঠোন—ছেলেদের খেলার জায়গা। জন পাঁচ ছয় শিক্ষক আছেন, তাদের মাসিক বেতন তিন টাকা থেকে সাত টাকার মধ্যে।

বলা বাহুল্য সাত টাকা পান প্রধান শিক্ষক, এবং এখানকার স্থানীয় ডাকঘরের যিনি পোস্টমাস্টার তিনি বেতন পান আট টাকা, এবং পাঠশালায় পড়িয়ে পান বারো টাকা। কিন্তু এই প্রকার অল্প বেতনে তাঁরা কেউ বিশেষ দুঃখিত নন। পঞ্চাশ-ষাট জন ছাত্র আছে ইস্কুলে—তা'রা সকলে মাইনে দেয় না, কিন্তু তা'র জন্য তালুকদার সাহেব দুঃখিত নন। ইস্কুল চললেই তিনি আনন্দ পান। গ্রামবাসীদের প্রতি এই মুসলমান ভদ্রলোকদের নিঃস্বার্থ প্রীতি লক্ষ্য ক'রে সেদিন আমি অভিভূত হয়েছিলুম।

ছাত্রদের অনেকেই ইস্কুলে আসে না। কেউ গরু নিয়ে যায় মাঠে, কেউ মাঠে যায় তা'র বাপকে পান্তা পৌঁছে দিয়ে আসতে। বর্ষাকালে হাবুডুবু জলে ছেলেরা সাঁতার দিয়ে আসে ইস্কুলে, তারপর ইস্কুলঘরের মধ্যেই শুয়ে জ্বরে কাঁপতে থাকে; বছরের বাকি সময়টা চাষের কাজে তা'রা ফরমাস খাটে,—ফসল ঘরে উঠলে ত তাদের চুলের টিকি দেখবার জো নেই। বেশীর ভাগ ছেলের গায়ে জামা দেখছিনে, কোমরে যেটুকু বস্ত্র জড়ানো আছে, তা'তে নিতান্ত উলঙ্গ বলা চলে না। হঠাৎ যদি কোনো ছেলে একটা ছাপমারা নতুন কাপড়ের ফতুয়া গায়ে চড়িয়ে আসে, তবে সে মূর্তিমান বেমানান,—অন্য ছেলেরা সবিস্ময়ে তা'কে ঘিরে নতুন জামাটি দেখতে থাকে। জুতো কারো পায়ে নেই, এক জোড়া জুতো তা'রা কল্পনাও করে না। সকাল

বেলা হয়ত দু'টি পান্তা খেয়ে তুই ক্রোশ দূর থেকে আসে,—সন্ধ্যাবেলা ফিরে গিয়েও যা খায় তাও গরুর খাদ্য নয়। গ্রামে যখন মড়কের ঢেউ আসে, তখন ছাত্রদের অনেককেই খুঁজে পাওয়া যায় না—শিক্ষকরাও জানে তা'রা আসে না কেন—সুতরাং একদিন ইস্কুলের খাতা থেকে সেই কচি কচি শিশুদের নামগুলো নিঃশব্দে মুছে যায়। এরাই নাকি দেশের ভবিষ্যৎ, এদের হাতেই নাকি দেশের দায়িত্বভার,—এরাই নাকি একদিন জগতের সামনে ভারতের মুখোজ্জ্বল করবে। এত বড় হাস্যকর আশ্বাস বোধ হয় পৃথিবীর কোনো দেশে নেই।

মৃত্যু যে এত স্বাভাবিক, এত দৈনন্দিন—এ গ্রামে আসবার আগে জানতুম না। কাল যাকে দেখেছি, আজ সে কোথাও নেই। হয়ত সে কর্মী, কিম্বা দানশীল, কিম্বা ভালো লোক—কিন্তু কই, মহতের অপমৃত্যুতে কারো মন কাঁদে না। প্রাণের মধ্যে এত অসাড়তা, স্বভাবে এত জড়তা, জীবনের এমন ভয়াবহ অপচয়। মেয়েরা পাতা কুড়োতে যায় জঙ্গলে, কিম্বা কাঠ নিতে ঢোকে খড়ির ঘরে, কিম্বা জল সংগ্রহ করতে যায় কোথাও অগম্য স্থানে—সাপে ছোবল দিল তাদের হাতে-পায়ে। সর্পাঘাতে মরেছে অমুকের ঘরের বৌ অথবা মেয়ে—এ ঘটনা প্রায় প্রাত্যহিক। চিকিৎসা হোলো তুকতাক, কিম্বা মুষ্টিযোগ অথবা বড় জোর কোনো শিকড়ছেঁচা ওষুধ। কোনো মেয়ে মরা শিশু প্রসব করে, অথবা প্রসব করতে না পেরে কোনো

বৌয়ের অপমৃত্যু। গ্রামে সেই সব লোকের সংখ্যা অতি অল্প—যাদের স্ত্রী বেঁচে রয়েছে বিশ ত্রিশ বছর। স্ত্রীর মৃত্যুতে কোনো স্বামী শোকাচ্ছন্ন রয়েছে—এ দৃশ্য—বলতে লজ্জিত হচ্ছি—এ গ্রামে একটিও চোখে পড়ে নি। এ দেশে স্ত্রীলোকের দাম কতটুকু, তা' স্ত্রীলোক হ'য়ে যারা জন্মেছে তা'রা বেশ জানে।

এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে বড় হাট। সেই হাট দেখতে গেলুম সেদিন। মনিরুদ্দি বললে, একখান গামছা ল্যায় দু'টাকা—কা'র খ্যামোতা আছে কিনবে ?

বললুম, হাটে কাপড় নেই ?

মনিরুদ্দি বললে, আছে, বেচবে না!

কেন ?

দর চড়িয়ে ব'সে আছে বাবু ওই আড়ৎদাররা—একখান আট-হাতির দাম বারো টাকা! জালি গামছাই নে যাই—

হাটে কিছু কিছু শাকসব্জি রয়েছে, কিন্তু মহাজন আর আড়ৎ-দার ছাড়া অত দিয়ে সব্জি কিনবে কে ? কেরোসিন বড়-লোকের জন্য। চিনির কোনো চিহ্ন নেই। সম্প্রতি নুন এসেছে সিরাজগঞ্জ থেকে—নুনের চারদিকে লোকের ভিড়। একটি ছাগলছানার দাম ছিল পাঁচ সিকা—এখন সেটি আট টাকা। আলু চোদ্দ আনায় তিন পোয়া। এখন যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের কাল। যুদ্ধে যারা যোগ দেয় নি, দুর্ভিক্ষ তাদের স'য়ে নিতে হবে বৈ কি।

মোল্লা বলে, মাছ আর নাই···সব চালানি কারবার। দু'আনার মাছ বাবু, মহাজনরা কেনে এক টাকায়। কলকাতাতে যারা সাড়ে তিন টাকায় বেচছে। মাছ খাবেন ক্যামনে?

বিলে মাছ ধরে জেলেরা। মহাজনরা দর বেঁধে দেয় তিরিশ টাকা। জেলেরা যদি রাজি না হয়, মহাজনরা চক্রান্ত ক'রে সেই মাছ দেয় পচিয়ে। অবশেষে জেলেরা রাজি হয়। বরফ দিয়ে সেই মাছ নানা দিকে চালান যায়,—একশো টাকার বেশী তা'র দর। নায়েব মশাই আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, যারা ধনী লোক, তা'রা এ যুদ্ধে আমীর হ'য়ে গেল, আর যারা গরীব তা'রা হোলো ফকির—অথবা ম'রে গেল না খেয়ে।

মোতাহার ডাক্তার বললেন, আপনি এবার চ'লে যাবেন শুনছি, কিন্তু যাবেন কেমন ক'রে?

বললুম, নৌকো একখানা কোনোমতে পাওয়া যাবে না?

তিনি বললেন, নদীতে জল কই? তা' ছাড়া কচুরীতে পথ বন্ধ।

বললুম, তা'হলে গরুর গাড়ী ভিন্ন উপায় নেই!

মোতাহার বললেন, তা' মাইল দশেক পথ। কিন্তু মোষ গরুর অবস্থাও তেমনি, গাড়ী টানতে পারবে কি?

ভেবে চিন্তে আমি বললুম, তা'হলে আমাকে হেঁটেই যেতে হবে!

—হেঁটে? অমন কাজ করবেন না,—আজকাল আকালের সময়···ওদিকে পথঘাট ভালো নয়···কা'র মনে কি আছে!

হাসিমুখে বললুম, চোর-ডাকাতের কথা বলছেন ?

মোতাহার বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ—

বললুম, আমার কাছ থেকে যদি তারা কেড়েকুড়ে কিছু নেয় দুঃখিত হব না। তবু জানবো দেশে মানুষ আছে··· জানবো মরবার আগে তা'রা কেড়ে খেতে জানে।

মোতাহার বললেন, চোদ্দ টাকা ধানের দর, আটাশ টাকা চা'ল —লোকে এখন বেপরোয়া। ডাল পাওয়া যায় না, সব্জি নেই, তা'র ওপর এই ভয়ানক কলেরা! কলেরা মানে কি জানেন ? মুখ তুলে তাকালুম। তিনি বললেন, এক বছর কলেরা মহামারী হ'লে তিন বছর ফলন হয় না। তা' ছাড়া এবার বীজধান খেয়ে ফেলেছে অনেকে। আসছে বছর অবস্থা আরো খারাপ।

বললুম, কিন্তু রাজার খাজনা ত দিয়ে আসতে হবে কাছারিতে!

আজ্ঞে হ্যাঁ—মোতাহার বললেন, মানুষ যদি কেউ বেঁচে না থাকে তবে কুকুরের কাছেও ওরা খাজনা আদায় করবে। ওদের টাকা মারা গেলে চলবে না।

কিন্তু ওরা কি সত্যিই এমনি ক'রে টাকা আদায় করে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এ গাঁয়ের লোক ম'রে গেলে ওরা অন্য গাঁয়ের লোক আনে। যাদের কাছে খাজনা আদায় হয় না, তা'রা যত পুরনোই হোক তাদের তাড়ায় জমি থেকে। রামের বদলে শ্যাম পায় পত্তনী, কিম্বা খাস ক'রে নিয়ে বরগা দেয়। এই ওদের কাজ···ওরা দয়াধর্মের ধার ধারে না—

বললুম, কিন্তু এতে ত বিবাদ বাধে !

বিবাদ ! বিবাদই ওরা চায়। এক হাতে ওরা বিবাদ বাধায়, অন্য হাতে সেই বিবাদ মেটাবার চেষ্টা করে—এই ওদের নীতি। এক দলকে উস্কে দেয়, অন্য দলের বিরুদ্ধে। একজনের কাছ থেকে আরেক জনকে কৌশলে সরিয়ে রাখে। দুইদলে যখন মারামারি কিম্বা মামলা বাধে, ওরা মাঝখানে দাঁড়িয়ে সালিশি করে।

বললুম, আচ্ছা ডাক্তার সায়েব, যদি সব প্রজারা একসঙ্গে মেলে ?

মোতাহার বললেন, হবে না···কোনোদিন ওরা এক হ'য়ে মিলবে না। যতদিন ওদের জমিদারি থাকবে, যতদিন থাকবে ওই খাজনা আদায় করার কাছারি, ততদিন প্রজাদের মধ্যে মিল হবে না। মামলা লেগে থাকবে, মারপিট থাকবে, দলাদলি থাকবে।

ছোটবেলা থেকে শুনতুম, গ্রামে কত শান্তি, জীবনযাত্রা কত নিরুদ্বেগ, মানুষে এখানে বাস করে প্রকৃতির কত কাছাকাছি। শান্তি ত বটেই—কারণ একদিকে দিগন্ত জোড়া মাঠ, অন্যদিকে বাঁশবাগান আর ঝোপঝাড়, নগরের ঘিঞ্জি পল্লীর গায়ে-গায়ে থাকা অসংখ্য মানুষের কোলাহল-মুখরতা নেই। জীবনযাত্রা নিরুদ্বেগ মানে—কলকারখানা নেই, মিলিটারি লরী চাপা পড়ার ভয় নেই। আর প্রকৃতির কাছাকাছি মানুষ বাস করে এই

কারণে যে, বহুলোক এখানে মাটির ওপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকে, দেশের লোকের খাদ্যসম্ভার জোগায়। পল্লীগ্রাম আনন্দের বস্তু ছিল সেইদিন, যেদিন ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ—যেদিন পল্লীগ্রাম সর্বস্বান্ত হয় নি—যেদিন সে প্রাচুর্যে আর ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হ'য়ে থাকতো।

কিন্তু গ্রাম যে এমন নিঃস্ব এ আমি আগে কল্পনা করি নি। কত জীবনের কত অভিযান চলেছে কত দিকে, মানুষের কত আবিষ্কার পৃথিবী জয় ক'রে চলেছে, কত নব নব সভ্যতা আর কাহিনী গ'ড়ে তুলছে আজকের মানুষ,—এ গ্রামে তাঁর কোনো সংবাদ নেই। এখানে মানুষ কোনোমতে দু'টি অন্ন খুঁটে খায়, রোগে ভোগে, একদিন নিঃশব্দে দেনাপাওনা চুকিয়ে চ'লে যায়। মৃত্যুর অসাড়তাকে শান্তি বলবো না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নেই, তাই ব'লে বলবো না এখানকার জীবন নিরুদ্বেগ; দুর্বলের বিষয়-বৈরাগ্যকে বলতে পারবো না—গ্রামবাসীর শান্তিপ্রিয়তা। মানুষের সর্বপ্রকার বলিষ্ঠ আদর্শ নিয়ে ওদের বাঁচা চাই—সেজন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য সুস্থ দেহের জন্য, নিরাপদ জীবন ধারণের জন্য, এবং পরিশেষে নিজেদের জন্মগত দাবি আর অধিকারের জন্য—সংগ্রাম চালাতে হবে। কল্যাণের আয়োজন ওদের সম্পূর্ণ হোক।

আমার যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। এই খবরটি পেয়ে

তালুকদার সাহেব আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। বললেন, কয়েকটি লোক আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চায়। আমি একটি সভা ডেকেছি।

হেসে বললুম, সভায় ত আলাপ হয় না!

তা' হোক, আপনি কিছু বলুন, আমরা শুনি।

ইস্কুল ঘরের পাশে ছোট্ট আঙনটিকে বেঞ্চি আর চাটাই পেতে তালুকদার সভার আয়োজন করেছিলেন। সেদিন হাটের বার ছিল, সুতরাং কৌতূহলী জনতার অভাব হয় নি। কেউ মোট নামিয়ে বসলো, কেউ এলো লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে, কেউ বা বসলো গরু বেঁধে রেখে। গাছতলায় উবু হ'য়ে ব'সে কেউ তামাক ধরায়, কেউ কলকাতার বাবুর দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে। যারা ভব্যযুক্ত, তা'রা গামছা প'রে ধুতি গলায় জড়িয়ে এসেছে। আমি ওদের নই, তা' ওরা বেশ জানে। আমি বাইরের লোক, বাইরে চ'লে যাবো—তাও জানে ওরা। ওরা বোঝে না আমার বিদ্রূপ, আমার বক্রোক্তি, আমার চোখের চাহনি, আমার বলার ভঙ্গি। ওরা বুঝতে পারে না, আমার বাংলা ভাষা, ইংরেজীর তর্জমা করা শুদ্ধ ভাষা। ওদের কিছুতেই বোঝাতে পারবো না, আমি কি বলতে চাই—কারণ ওরা বুঝবে না। আমি কেবল ভিন্ন শ্রেণী নয়, ভিন্ন জীবও বটে। ওদের চোখে আমি কেবল কৌতুক, কেবল কৌতূহল; ওদের বিচারে আমি শহুরে সং, আমি হাস্যকর। আমার বক্তৃতা

যত গরম, যত আবেগময় হ'য়ে ওঠে—ওরা অবাক হয়, বিস্ময় মানে, এবং মুখ লুকিয়ে সকৌতুকে হাসে। আমরা ওদের মনে করি অসভ্য, বর্বর, গ্রাম্য ; আর ওরা আমাদের মনে করে, অদ্ভুত একটা জীব।

ওদের সঙ্গে আধুনিক জীবনধারার যোগ নেই, এইটি আজ সকলের বড় সর্বনাশ। ওদের টেনে আনতে হবে বর্তমান যুগে, ওদের আনতে হবে বাইরের আলো-হাওয়ায়। কে আনবে? কে সেই মহৎ বিপ্লবী? শহর থেকে তা'রা যাবে না, বিলেত কিম্বা আমেরিকা থেকে তা'রা কেউ আসবে না—ওদের ওই মাটির তলা থেকে যুগপ্রবর্তককে সকল বাধা, সকল বিপত্তি ঠেলে উঠে' দাঁড়াতে হবে। ওদের মাটি ওদের হাতেই ফেরৎ দিতে হবে। ওদের ওই বন্ধনজর্জর আত্মাকে মুক্তি দিয়ে বলতে হবে, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত—

এ যুগের কলঙ্ক তবেই ঘুচবে!

গ্রামের মন্দিরে যে অন্নদাতা দেবতা প্রতিষ্ঠিত, বহু শতাব্দির অপমানে তিনি নতশির,—লক্ষ লক্ষ জীবনের বিপুল অপচয়ের মাঝখানে ব'সে সেই অপমানিত দেবতা মানুষের মতো মানুষের পথ চেয়ে রয়েছে। কিন্তু নৈরাশ্যে সেই দেবতার চোখে অশ্রু জমেছে।

ওই মানহারা সর্বহারা চাষীর দরজায় গিয়ে করযোড়ে আমাদের বলতে হবে—তোমরা বেঁচে ওঠো, নৈলে আমাদের

মৃত্যু অবধারিত। তোমরা মানুষ হও, নৈলে আমরা মনুষ্যত্বের পথ খুঁজে পাবো না। তোমরা জীবনের সকল গৌরব ফিরিয়ে আনো, নৈলে ভাবীকালের ইতিহাসে আমাদের কলঙ্ক কোনো-দিন মুছবে না!

এই ভাবে আমার শেষ কথা জানিয়ে আমি বিদায় নিলুম।

মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭৩ মাণিকতলা স্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।